**International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)**
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Impact Factor: 6.8
Volume-XII, Issue-IV, July 2026, Page No. 01-18
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
**DOI: 10.29032/ijhsss.vol.12.issue.04W.341**

# বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের সাত দশক: বিবর্তন ও সামাজিক পরিবর্তন

## এ কে এম জিয়াউর রহমান খান

*সহযোগী অধ্যাপক, যোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ*

Received: 24.07.2026; Accepted: 26.07.2026; Available online: 31.07.2026
©2026 The Author(s). Published by Scholar Publication. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

## Abstract

*This study explores the evolution of Bangladeshi cinema over seven decades and its intricate relationship with social transformation. Using a qualitative research methodology based on secondary data, the research provides a comprehensive decade-wise analysis of filmmaking trends and socio-cultural contexts, The journey begins with the first film, 'Mukh O Mukhosh' (1956), which emerged as an expression of Bengali identity and nationalist consciousness. The analysis argues the 1960s' focus on folklore and middle-class crises, the 1970s' post-Liberation War narratives and social realism, and the 1980s' shift toward folk-fantasy and action genres. It further examines the critical challenges posed by the rise of satellite television, piracy, and a period of obscenity during the late 1990s and early 2000s, which led to a significant decline in traditional theater-going audiences. Ultimately, the research highlights the resurgence of the industry through digital technology and the emergence of OTT (Over-The-Top) platforms, which have opened new possibilities for contemporary filmmakers. From traditional theater-based popularity to the modern digital era, this paper illustrates how cinema has served as a mirror to the nation's aspirations, struggles, and shifting social values. It concludes that despite various technological and commercial hurdles, Bangladeshi cinema continues to adapt and reflect the ongoing social transformation of the nation.*

**Keywords:** Bangladeshi Cinema, Social Transformation, Cinematic Evolution, socio-cultural contexts, Seven Decades, Film Genres.

চলচ্চিত্র মাধ্যম হলো সমাজের দর্পণ। যে আয়নার মানুষ তার জীবনের প্রতিফলন দেখতে চায়। গণমাধ্যম হিসাবে চলচ্চিত্র কেবল বিনোদন মাধ্যমে আবদ্ধ নয় উপরন্তু একটি নির্দিষ্ট সময়কালের সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিবর্তনের প্রামাণ্য দলিল। বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি ঢাকায় নির্মিত চলচ্চিত্রের যাত্রাকাল থেকে শুরু করে ১৯৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তীকালে গণযোগাযোগের এই শক্তিশালী মাধ্যমটি মানুষের আশাআকাঙ্ক্ষা, জাতীয়তাবাদী চেতনা এবং সামাজিক রূপান্তরের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে। বৈরি রাজনৈতিক ও ভৌগলিক প্রতিকূলতা কাটিয়ে 'মুখ ও মুখোশ' সিনেমার মাধ্যমে চলচ্চিত্র শিল্পের যে সূচনা হয়েছিল তা ছিল বাঙ্গালির নিজস্ব সংস্কৃতির স্বকীয়তা ও জাতীয়তাবাদী চেতনার বহিঃপ্রকাশ। ষাটের দশকে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে জীবন ও সমাজ বাস্তবতাকে চলচ্চিত্রে ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস থেকে চলচ্চিত্র নির্মাণের যে প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়, তারই ধারবাহিকতায় সে সময় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের চলচ্চিত্র নির্মাণের ধরন, প্রকরণ ও আঙ্গিকে পরিবর্তন দেখা যায়। ষাটের দশকে উর্দু ভাষায় নির্মিত ছবির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে শহরে মধ্যবিত্ত জীবনের সংকটের পাশাপাশি লোকজ ঐহিত্যকে উপজীব্য করে নির্মিত সিনেমা দেশীয় চলচ্চিত্রের গতিপথ নির্ধারণে ভূমিকা পালন করেছে। মুক্তিযুদ্ধ

পরবর্তী বাস্তবতা ও পরিবর্তিত প্রেক্ষাপট বাংলাদেশি চলচ্চিত্রে সামাজিক পরিবর্তনের নতুন ধারার সূচনা করে। সামাজিক প্রেক্ষাপট ও প্রযুক্তির বিকাশে পরবর্তী দশকগুলোতেও চলচ্চিত্রে বিবর্তনের এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে।

**গবেষণা পদ্ধতি:**

বক্ষ্যমান প্রবন্ধটি মাধ্যমিক উৎস নির্ভর একটি গবেষণাকর্ম। প্রাপ্ত তথ্যগুলোকে বিশ্লেষণের মাধ্যমে গুণগত গবেষণা পদ্ধতিতে (Qulalitive redearch method) গবেষণাটি সম্পন্ন হয়েছে। গবেষণাটিতে বর্ণনামূলক ও বিশ্লেষণধর্মী গুণগত পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশি চলচ্চিত্রের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং সামাজিক রূপান্তরের মেলবন্ধন খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে। গবেষণার সকল তথ্য মাধ্যমিক উৎস থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

মাধ্যমিক তথ্যের উৎস হিসাবে চলচ্চিত্র বিষয়ক বিভিন্ন গ্রন্থ ও গবেষণা প্রবন্ধ, ইতিপূর্বে প্রকাশিত গবেষণাকর্ম, সমসাময়িক সংবাদপত্র ও সাময়িকী, জার্নাল, চলচ্চিত্র সমালোচনা ও আর্কাইভের সহায়তা নেয়া হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে তথ্যসূত্র উল্লেখ করা হয়েছে। মাধ্যমিক তথ্যের গুণগত বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের বিবর্তনের একটি সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

**বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া:**

সংগৃহীত তথ্যগুলোকে বিশ্লেষণের জন্য দশকভিত্তিক পর্যালোচনা পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। ১৯৫০ এর দশক থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রায় সাত দশকের প্রতিটি দশকে চলচ্চিত্রের আধেয়, নির্মাণের ধরন ও বৈচিত্র্য তৎকালীন আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে নিবিড়ভাবে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

**স্বাধীনতা পূর্ববর্তী চলচ্চিত্র:**

১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের পর রাজনৈতিক পট পরিবর্তনে ঢাকা পূর্ববাংলার মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে। এর আগ পর্যন্ত ঢাকায় কোন চলচ্চিত্র ইন্ড্রাস্ট্রি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তবে উপমহাদেশে চলচ্চিত্রের সূচনালগ্ন থেকেই ঢাকাকে নির্মাণের দিক থেকে না হলেও প্রর্দশনের দিক থেকে উল্লেখ্যযোগ্য কেন্দ্র হিসাবে বিবেচনা করা হতো। পঞ্চাশের দশকে প্রথমে কলকাতায় নির্মিত বাংলা ছবি ছিল এখানকার দর্শকের একমাত্র ভরসা। পরে পুরো দশক জুড়ে একই ঢংয়ে নির্মিত লাহোরের উর্দু ছবি এবং বোম্বের হিন্দি ছবি নগরকেন্দ্রিক বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত দর্শক শ্রেণিকে আকৃষ্ট করে। ঢাকাসহ পূর্ববঙ্গের সিনেমা হলগুলোতে হিন্দি ও উর্দু ছবির পাশাপাশি লাহোর, কলকাতা, মাদ্রাজ, হলিউড, রোম, প্যারিস, টোকিও, লন্ডনে নির্মিত বিভিন্ন চলচ্চিত্রের প্রদর্শনী হয়েছে। দেশ বিভাগের পর পূর্ব পাকিস্তানে ভাষাকেন্দ্রিক জাতীয়তাবাদ ও নিজস্ব সাংস্কৃতিক পরিচয় নির্মাণের প্রচেষ্টায় এদেশের সাংস্কৃতিক কর্মীদের মধ্যে বাংলা ভাষায় চলচ্চিত্র নির্মাণের তাগিদ অনুভূত হয়। ভাষা আন্দোলনের রক্তাক্ত অধ্যায়ের পর চলচ্চিত্র ছাড়াও সাহিত্য, সঙ্গীত, নাট্যকলাসহ সংস্কৃতি অঙ্গনে গতিধারা সঞ্চার হয়। তারই ধারাবাহিকতায় প্রতিকূল পরিবেশে কয়েকজন উদ্যমী মানুষ চলচ্চিত্র নির্মাণের উদ্যোগ নেন।

ভাষায় আন্দোলেনের এক বছরের মাথায় ১৯৫৩ সালের শুরুতে সচিবালয়ে পরিসংখ্যান ব্যুরোর পরিচালক ড. আবদুস সাদেকের উদ্যোগে ঢাকায় চলচ্চিত্র নির্মাণ বিষয়ক এক মত বিনিময় সভায় অবাঙ্গালী চলচ্চিত্র ব্যবসায়ী ফজলে দোসানীর 'অত্র অঞ্চলের আর্দ্র আবহাওয়া চলচ্চিত্র নির্মাণের উপযোগী নয়' বক্তব্যের প্রতিবাদ করে প্রকৌশলী ও সংস্কৃতিক কর্মী আবদুর জব্বার খান আগামী এক বছরের মধ্যে চলচ্চিত্র নির্মানের ঘোষনা দেন (আসগর, ২০০২:৭০) । সভায় পূর্ববঙ্গে বাংলা ভাষায় চলচ্চিত্র নির্মাণের ঘোষণার কয়েক মাসের মধ্যেই

আবদুল জব্বার খান 'ইকবাল ফিল্মস লি.' নামে একটি প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান গঠন করে তার 'ডাকাত' নাটকের কাহিনি অবলম্বনে পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণের উদ্যোগ নেন। ১৯৫৬ সালের ৩ জুন প্রথম সবাক বাংলা চলচ্চিত্র ‘মুখ মুখোশ’ মুক্তি পায়। যদিও ছবিটি নির্মাণের প্রসঙ্গটি একরকম হঠাৎ করে চলে আসে, কিন্তু এর পেছনে রয়েছে বাঙ্গালি-মুসলমানের সাংস্কৃতিক আধুনিকতা ও জাতীয়তাবাদী চেতনা (নাসরিন ও হক, ২০০৮:৪০)। সমালোচকরা যদিও মনে করেন, আজকের প্রেক্ষাপটে দেখলে 'মুখ ও মুখোশ' হয়তো চিত্তকে আলোড়িত করতে পারবে না, তখন পূর্ণাঙ্গ একটি ছবি ঢাকাতেই নির্মিত হয়েছে বলে এক ধরনের আনন্দ মিশ্রিত উত্তেজনা নিয়ে সে সময়কার ঢাকার দর্শকরা ছবিটি দেখেছে। ছবিটি নির্মিত না হলে সে সময় পূর্ব পাকিস্তানের চলচ্চিত্র নির্মাণ প্রচেষ্টা হয়তো আরও কয়েক বছর পিছিয়ে যেতো (মাযহার, ২০০৮) ।

তবে এর আগে ১৯৪৮ সালের মার্চে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর পূর্ববঙ্গ সফরের উপর ভিত্তি করে কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে নাজির আহমেদের পরিচালনায় 'ইন আওয়ার মিডষ্ট' নামে ঢাকায় প্রথম তথ্যচিত্র নির্মিত হয় (হায়াৎ, ১৯৮৭)। এ সময় বেসরকারিভাবে বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে পূর্ব বঙ্গে ষ্টুডিও স্থাপন ও চলচ্চিত্র নির্মাণের উদ্যোগ পরিলক্ষিত হলেও সেগুলো শেষ পর্যন্ত আলোর মুখ দেখেনি। 'মুখ ও মুখোশ' মুক্তির আগে ১৯৫৫ সালের জুন মাসে ঢাকার তেজগাঁয়ে পূর্ববাংলার চলচ্চিত্র বিভাগের ষ্টুডিওর যাত্রা শুরু হয়। ১৯৫৭ সালে ৩ জুন পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদে যুক্তফ্রন্ট সরকার কর্তৃক 'পূর্ব পাকিস্তান চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা (ইপিএফডিসি)' নামে বিল পাসের মাধ্যমে ঢাকায় চলচ্চিত্র শিল্পের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। স্থাপিত হয় একটি পূর্ণাঙ্গ ফিল্ম ষ্টুডিও ল্যাবেরেটরি। ১৯৫৭ সালে এফডিসি প্রতিষ্ঠার পর প্রথমে ফতেহ লোহানি পরিচালিত 'আসিয়া' চলচ্চিত্রের কাজ শুরু হয়। কিছুদিনের মধ্যে এফডিসি কর্তৃপক্ষ ‘আকাশ আর মাটি ,‘মাটির পাহাড়’, ‘এ দেশ তোমার আমার’ এবং ‘জাগো হুয়া সাভেরা’ সহ ৫/৬ টি চলচ্চিত্র নির্মানের অনুমতি দেয় (হায়াৎ, ২০০৭)।

ষাটের দশকে আফ্রিকা ও ল্যাতিন মেরিকার মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে অনেক মেধাবী নিমার্তার আর্বিভাব ঘটে। পশ্চিম বাংলায় সত্যজিত রায়, ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেনের মতো পরিচালকরা সমসাময়িক সমস্যা, সমাজ এবং আবহমান বাংলাকে উপজীব্য করে একের পর এক কালজয়ী সিনেমা নির্মাণ করেছেন। তাদের উত্তরসূরি একঝাঁক মেধাবী নির্মাতা জীবন ও সমাজ বাস্তবতা, জাতীয় ও আঞ্চলিক রাজনীতি, মধ্যবিত্তের জীবন ও সংকট, সমাজে বিদ্যমান শ্রেণি বৈষম্য, জাতপাতের দ্বন্দ্ব, সমকালীন সংকট-সম্ভবনা নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণ করতে থাকেন। বাংলাদেশি নির্মাতাদের চলচ্চিত্রে আবহমান গ্রাম বাংলার রূপ ও সংস্কৃতি, মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্তের মানবিক সংকট নিয়ে কিছু প্রচেষ্টা থাকলেও বাণিজ্যিকভাবে তেমন সফল হতে পারেনি। ষাটের দশকের শুরুতে উর্দু ছবির দাপটে অপেক্ষাকৃত নবীন বাংলা ছবির নির্মাতারা খেই হারিয়ে ফেলেন। চলচ্চিত্র নির্মাতা ও গবেষক মতিন রহমান (২০২১) মনে করেন, 'ষাটের দশকের চলচ্চিত্র আমাদের সংগ্রাম, সংস্কৃতির ও ঐতিহ্যের হয়তো পুনর্নির্মাণ করতে পারেনি। কিন্তু সে সময়কালে চলচ্চিত্র পরিচালকরা সৃষ্টিশীল চিন্তায় এবং মৌলিক অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ ছিল। আত্মপরিচয় ও মুখের ভাষা, স্বাধীকার এবং স্বাধীন জাতিরাষ্ট্রের জন্য সংগ্রাম-সংকটকালে বাংলা জনপদের প্রাকৃতিক ভূমি, জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা নিয়ে মগ্ন ছিল।' ষাটের দশকের শুরুতে ঢাকাসহ কয়েকটি প্রধান শহরকেন্দ্রিক প্রেক্ষাগৃহ থাকায় একদিকে দর্শক যেমন ছিল, সীমিত তেমনি গ্রামীণ জনপদের বিপুল সংখ্যক মানুষ রূপালী পর্দার আনন্দ লাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। ঢাকাসহ বড় শহরগুলোর স্বল্প সংখ্যক মধ্যবিত্তের বাইরে গ্রামীণ ও নিম্নবিত্তের এক বিশাল জনগোষ্ঠী তখনও বিনোদনের প্রধান মাধ্যম হিসাবে যাত্রা কিংবা লোকজ মাধ্যমের উপর নির্ভরশীল ছিল।

'আসিয়া' এফডিসিতে নির্মিত প্রথম ছবি হলেও উর্দু ভাষায় নির্মিত এ কে কারদারের ‘জাগো হুয়া সাভেরা' পূর্ববাংলার প্রথম চলচ্চিত্র হিসাবে ১৯৫৯ সালের ৮ মে মুক্তি পায়। একই বছরের ২৪ জুলাই ফতেহ লোহানি 'আকাশ আর মাটি', ২৮ আগস্ট মহিউদ্দিনের ‘মাটির পাহাড়' এবং ২৪ ডিসেম্বর এহতেশামের 'রাজধানীর বুকে' মুক্তি পায়। ১৯৬০ সালে সালাউদ্দিনের 'রাজধানীর বুকে' এবং 'আসিয়া' মুক্তি পায়। ১৯৬১ সালে সালাউদ্দিনের ‘যে নদী মরুপথে', মোস্তাফিজের' হারানো দিন', মহিউদ্দিনের 'তোমার আমার' এবং জহির রায়হানের' 'কখনো আসেনি' মুক্তি পায়। একাধারে বাংলার গ্রামীণ এবং শহুরে মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনের পটভূমিতে নির্মিত এ সকল চলচ্চিত্রগুলোর মধ্যে সঙ্গীতবহুল 'রাজধানীর বুকে' এবং রহমান- শবনম জুটির 'হারানো দিন' বাণিজ্যিক সফলতা পেলেও অন্যগুলো ব্যর্থ হয়েছে বলা চলে। 'হারানো দিন' ছবির মাধ্যমে রহমান-শবনম বাংলা ছবির জগতে প্রথম রোমান্টিক জুটি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন। চলচ্চিত্র গবেষকরা প্রথম দিকে নির্মিত ছবিগুলোর শৈল্পিক বিচারে ব্যর্থতার পেছনে পরিচালকদের নান্দনিক ও কারিগরি প্রস্তুতির অভাবকে দায়ী বলে মনে করেন। প্রাথমিক বাংলা ছবি হিসাবে ‘মুখ ও মুখোশে’র মতো অন্য সিনেমাগুলা দর্শকের দিক থেকেও সমবেদনা মেলেনি। ছবিকে জনপ্রিয় করার মতো তারকা না হওয়ায় হিন্দি ও উর্দু ছবির সাথে প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে বাংলা ছবিগুলো মার খায় (নাসরিন ও হক, ২০০৮: ৪৪)।

৬০ এর দশকের চলচ্চিত্র দর্শকের একটি বিরাট অংশ ছিল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি। আবার মধ্যবিত্তের সাথে নিম্নবিত্তরাও চিত্ত বিনোদনের মাধ্যম হিসাবে চলচ্চিত্রকেই বেছে নেয়। সত্যজিত রায়ের ‘পথের পাচালি’র অনুকরণে চিরায়ত গ্রাম বাংলার কাহিনি নিয়ে ফতেহ লোহানীর 'আসিয়া' ব্যবসায়িকভাবে ব্যর্থ হলেও পাকিস্তানের উভয় অংশে দু'টি পুরস্কার পায়। ষাটের দশকের একেবারে গোড়ার দিকে ‘ধারাপাত’ (১৯৬৩), ‘যে নদী মরুপথে’, ‘সুতরাং’, ‘কখনো আসেনি’ (১৯৬১), ‘কাঁচের দেয়াল’ (১৯৬৩)– এর মতো সৃজনশীল ও সমাজসচেতন চলচ্চিত্র তৈরি হলেও সেগুলো বাণিজ্যিক সাফল্য লাভ করেনি। এ সময় প্রযোজকরা লাভের আশায় উর্দু সিনেমা নির্মাণের দিকে ঝুঁকে পড়ে।

ফলে পূর্ব বাংলার নির্মাতারা এখানকার প্রকৃতি ও জীবনকে উপজীব্য করে বাংলার পরিবর্তে উর্দু ভাষায় চলচ্চিত্র নির্মাণে আগ্রহী হয়ে পড়েন। এর কারণ হিসাবে অনেকেই আবার পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান উভয় অংশের দর্শকের চাহিদার বিষয়টিও সামনে নিয়ে আসেন। ১৯৬২ সালে উর্দু ভাষায় নির্মিত এহতেশামের 'চান্দা'র পাকিস্তানের উভয় অংশের বাণিজ্যিক সাফল্য এখানকার নির্মাতাদের উর্দু ছবি নির্মাণের পালে হাওয়া দেয়। এর মধ্যে মুস্তাফিজের ‘তালাশ’(১৯৬৩), বেবি ইসলামের ‘তানহা’, জহির রায়হানের ‘সঙ্গম’ (১৯৬৪), রহমানের ‘মিলন’ (১৯৬৪), মুস্তাফিজের ‘মালা’ (১৯৬৫) ‘চকোরি’ (১৯৬৭), এসব ছবির দাপটে বাংলা ভাষার সিনেমা তখন বিপর্যয়ের মুখে পড়ে। চিত্র সমালোচক চিন্ময় মুৎসুদ্দী (১৯৮২) মতে, অভিনেতা-অভিনেত্রী, কলাকুশলী সবাই লাহোর, করাচীর অনুগ্রহভাজন হওয়ার বাসনায় উন্মুখ থাকতো। এই দ্বন্দ্ব ছিল চলচ্চিত্র নির্মাতা ও চিরন্তন মধ্যবিত্ত দর্শকশ্রেণির মধ্যে।

মধ্যবিত্ত জীবনের টানাপোড়েন, হতাশা ও সংকট নিয়ে নির্মিত 'কখনো আসেনি' (১৯৬১) এবং 'কাঁচের দেয়াল' (১৯৬২) এর বাণিজ্যিক ব্যর্থতার পর ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে কারাবরণকারী, প্রগতিশীল আন্দোলন কর্মী জহির রায়হানও উর্দু চলচ্চিত্র নির্মানের চলমান স্রোতে গা ভাসান।। উর্দু ভাষায় নির্মাণ করেন পাকিস্তানের প্রথম রঙ্গিন চলচ্চিত্র ‘সঙ্গম’ (১৯৬৪) এবং প্রথম সিনেমাস্কোপ ছবি ‘বাহানা’ (১৯৬৫)। নাসরিন ও হকের মতে, ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙ্গালীর সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয় বিকশিত হওয়ার ধারাবাহিকতায় চলচ্চিত্র একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আর্বিভূত হয়। তবে শুরুতেই উর্দুভাষায় আক্রান্ত হওয়াটা ছিল একটি ঐতিহাসিক বিপর্যয় (২০০৮: ৪৫)।

বাঙ্গালি নির্মাতাদের উর্দু ছবি নির্মাণের দিকে ঝুঁকে যাওয়ার অন্যতম একটি কারণ হতে পারে মাধ্যম হিসাবে চলচ্চিত্রের পুঁজির উপর নির্ভরতা এবং ব্যবসায়িকভাব টিকে থাকার প্রচেষ্টা। বাংলার পরিবর্তে উর্দু ভাষায় ছবি নির্মিত হলে ব্যবসায়িকভাবে পূর্ব বাংলার পাশাপাশি পশ্চিম পাকিস্তানের বাজারর প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষাও নেপথ্য কারণ হিসাবে হিসাবে কাজ করেছে। ষাটের দশকের প্রথমার্ধ থেকে মাঝামাঝি পর্যন্ত পূর্ববাংলায় উর্দু ছবি নির্মাণের জোয়ার দেখা যায়। এ সময 'তানহা', 'শাদী, ইয়ে ভি এক কাহানী', 'পয়সে, বন্ধন', 'কারওয়া', 'মিলন ও মালানে' এর মতো উর্দু চলচ্চিত্র নির্মিত হয়।

১৯৬৫ সালে সালাউদ্দিনের 'রূপবান' এর অভূতপূর্ব বাণিজ্যিক সাফল্য নির্মাতাদের বাংলা ভাষায় লোককাথাভিত্তিক চলচ্চিত্র নির্মাণে উৎসাহিত করে। আবহমান বাংলার সংস্কৃতি যাত্রাপালার কাহিনি নিয়ে নির্মিত 'রূপবান' (১৯৬৫) উর্দু ভাষার চলচ্চিত্রের বাণিজ্যিক সাফল্যকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে প্রতিযোগি হিসাবে আর্বিভূত হয়। লোককাথাভিত্তিক এই চলচ্চিত্রের কাহিনি এবং গানগুলো বহু বছর ধরে পূর্ব বাংলার গ্রামগঞ্জে যাত্রামঞ্চে পরিবেশিত হয়ে আসছিল। যাত্রামঞ্চে দর্শকের আপনজন রহিম, রুপবান ও তাজেলকে রুপালি পর্দায় কেমন লাগে তা দেখতে মানুষ হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল। গবেষক অনুপম হায়াৎ (২০০৭) এর মতে, 'রূপবান' ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে রেকর্ড সৃষ্টি করার ফলে নির্মাতারা লোককাথাভিত্তিক চিত্র নির্মাণের দিকে ঝুঁকে পড়ে। 'রূপবান'-ই ছিল বাংলা সিনেমা ইতিহাসের প্রথম সত্যিকারের সুপারহিট ছবি। 'রুপবান' নির্মানের বাজেট ছিল দেড় লাখ রুপি, অথচ আয় করেছিল প্রায় ২০ লাখ। রুপবান সে সময়ের রেকর্ড ১৭ টি হলে মুক্তি পেয়েছিল। দর্শকের কাছে রুপবানের প্রভাব একটাই ছিল যে, সে সময়কে অনেকে 'রূপবান যুগ' বলে থাকেন। কারণ তখন বাজারেও পাওয়া যেতো রুপবান নামের সিগারেট, আলতা, কেরোসিন তেল, ঢেউটিন এমনকি ঘুমের বটিকাও। ছবির একটি দৃশ্যে যেখানে রূপবানরুপী সুজাতা বাঁশে হাত রেখে গান গেয়েছিলেন, সেই বাঁশিটি নিলামে সে সময় ৬০ টাকায় বিক্রি হয়েছিল (মাজিদ, ২০২৫)। রূপবান সিনেমার অভূতপূর্ব সাফল্যে উর্দু ছবির দাপট কমে যায়, লোককাহিনিভিত্তিক ছবি নির্মানের হিড়িক পড়ে। 'বনবাসে রুপবান', 'আবার বনবাসে রুপবান', 'রহিম বাদশা ও রুপবান', 'সাত ভাই চম্পা', 'কমলার বনবাস', 'মহুয়া', 'কাঞ্চনমালা', 'বেহুলা', 'আলোমতি', 'গুনাইবিবি', 'সুয়োরানী দুয়োরানী', 'অরুন বরুন কিরনমালা'র মতো লোহকাহিনিগুলো চলচ্চিত্র আকারে নির্মিত হয়। শুধু রূপবান সিনেমার কাহিনী নিয়ে নির্মাণ হয়েছে আধা ডজনের বেশি সিনেমা। সমালোচকদের মতে, চলচ্চিত্র হবার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা না থাকলেও শুধুমাত্র জনপ্রিয়তাই উর্দু ছবির উল্টোস্রোতে 'বঙ্গসংস্কৃতি'র ছবিগুলোকে সফলতা এনে দিয়েছিল। এটা মূলত পশ্চিম পাকিস্তানি সংস্কৃতির বিপরীতে এদেশের নিজস্ব সংস্কৃতির চেতনার বিজয় ছাড়া অন্য কিছু ছিল না (আহমেদ, ১৯৯২: ৩৭)।

১৯৬৫ সালের ৬ সেপ্টেম্বর ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হলেও পাকিস্তানে ভারতীয় ছবি আমদানি ও প্রদর্শন নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। ভারতীয় ছবি বন্ধে পূর্ববাংলার চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্টরা আশ্বান্বিত হলেও এর পুরো সুবিধা পশ্চিম পাকিস্তানের নির্মাতারা তুলে নেয়। ষাটের দশকের মধ্যভাগের পর থেকে বাঙ্গালির স্বাধীকারের দাবিতে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে আত্মসচেতনতা জোরালো আকার ধারন করে। সরব হয় রাজনৈতিক অঙ্গন। এমনি এক প্রেক্ষাপটে ১৯৬৭সালের শুরুতে খান আতাউর রহমান পরিচালিত ইতিহাস ভিত্তিক চলচ্চিত্র 'নবাব সিরাজদৌলা' মুক্তি পায়। একাধারে বাংলা ও উর্দু ভাষায় নির্মিত এই চলচ্চিত্র তৎকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বাঙ্গালীর আত্মজাগরনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ষাটের দশক ছিল বাঙ্গালির জাতীয়স্বরূপ ও আত্মসচেতনতার দশক। এই দশকের উত্তাল রাজনৈতিক পরিস্তিতি ৬২ এর শিক্ষা আন্দোলন, ৬৪ এর দাঙ্গা, ৬৬ এর ছয় দফা ৬৮ এবং ৬৯ এর অভূত্থানের মতো রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনগুলো তখনকার নির্মাতাদের তেমন একটা স্পর্শ করতে পারেনি। চলচ্চিত্র সমালোচকরা মনে করেন' ৫০ এর দশকে পূর্ববাংলার রাজনৈতিক জীবনে যে উত্থান-পতন ঘটে তার তার কোন স্বাক্ষর তখনকার চলচ্চিত্রে নেই। সেই ঘটনা প্রবাহ এদেশের মানুষকে আলোড়িত করলেও তাতে চলচ্চিত্র নির্মাতাদের চেতনা জাগ্রত হয়নি (মুৎসুদ্দী, ১৯৮৭:৬৫)। অন্যদিকে শহুরে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত যারা তখনো পুরোপুরি বিকশিত হয়নি, নির্মাতারা তাদের জীবনকে চলচ্চিত্রে নির্মাণ করতে শুরু করেছিলেন। বহুকাল থেকে চলে আসা লোক সংস্কৃতি, শহুরে নব্য শিক্ষিত মধ্যবিত্তের নিজের গল্প বলার চেষ্টা ও চিরায়ত বাংলার গ্রামীণ উপাখ্যান ৬০ দশকের রাজনৈতিক ইতিহাসকে ছাপিয়ে সামাজিক ইতিহাসের টানাপোড়েন নিয়ে চলচ্চিত্রে হাজির হয়েছে। পরিবারে ভাঙ্গা-গড়া, সমাজে ধনী-গরিবের ব্যবধান, শহুরে উচ্চবিত্তের জীবনাচারণ, ভিন্ন ধারার সংস্কৃতির সঙ্গে মধ্যবিত্ত সমাজের চিরাচরিত সংঘাতও চলচ্চিত্রের ফুঁটিয়ে তোলা হয়।

উর্দু ছবির দাপটের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গোটা ষাটের দশক জুড়ে গ্রামীণ কৃষিজীবী সমাজের চিত্র যেমন হাজির হয়েছে তেমনি গ্রাম বাংলার চিরায়ত লোক সংস্কৃতির যাত্রা, পালাগান চলচ্চিত্রের পর্দায় উপস্থাপিত হয়েছে। ‘কখনো আসেনি’ (১৯৬১), ‘সূর্যস্নান’ (১৯৬২), ‘কাঁচের দেয়াল’ (১৯৬৩), ‘ধারাপাত’ (১৯৬৩), ‘সুতরাং’ (১৯৬৪), ‘নদী ও নারী’ (১৯৬৫), ‘বেহুলা’ (১৯৬৬), ‘কাগজের নৌকা’ (১৯৬৬), ‘আনোয়ারা’ (১৯৬৭), ‘আয়নাওঅবশিষ্ট’ (১৯৬৭), ‘এতটুকু আশা’(১৯৬৮), ‘আর্বিভাব’ (১৯৬৮), ‘অবাঞ্চিত’ (১৯৬৯), ‘ময়নামতি’ (১৯৬৯), ‘বিন্দু থেকে বৃত্ত’ (১৯৭০) এর মতো বাংলা ভাষায় নির্মিত চলচ্চিত্রগুলো দর্শকের কাছে সমাদৃত হয়। 'নবাব সিরাজদৌলা' (১৯৬৭) বিনোদনের বাইরে শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের জনগনকে বাঙ্গালি জাতীয়তাবোধ এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেরণা জোগায়। জহির রায়হান ঊনসত্তরের গণঅভূত্থান এবং স্বৈরাচারী আইয়ুব শাহীর পতনের পটভূমিতে নির্মিত 'জীবন থেকে নেয়া' (১৯৭০) চলচ্চিত্রের মাধ্যমে তৎকালীন বাঙ্গালীর বঞ্চনা ও স্বাধীনতা সংগ্রামের আন্দোলনকে রূপকের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন।

**৭০ এর দশক:**

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে নির্মাতা, কলাকুশলীতে অনেকেই সক্রিয়ভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। কেউ কেউ রণাঙ্গনে অস্ত্র হাতে, কেউ ক্যামেরাকে অস্ত্র বানিয়ে শত্রুর বিপক্ষে লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন। জাতীয় জীবনে গুরুত্বপূর্ন অধ্যায় হিসাবে সংস্কৃতির অন্যান্য শাখার মতো চলচ্চিত্রেও মুক্তিযুদ্ধ প্রধান আধেয় হিসাবে উপস্থিত হয়। যুদ্ধের মাঝামাঝি পর্যায়ে জহির রায়হান বিপন্ন শরাণার্থীদের মানবেতর জীবন এবং গণহত্যা বন্ধের দাবি জানিয়ে নির্মাণ করেন প্রমাণ্যচিত্র 'স্টপ জেনোসাইট'। যুদ্ধ চলাকালে জহির রায়হানের ‘স্টেট ইজ বর্ন', আলমগীর কবিরের 'লিবারেশন ফাইটার্স' এবং বাবুল চৌধুরীর ‘ইনোসেন্ট মিলিয়নস' প্রামাণ্যচিত্রগুলো মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে আর্ন্তজাতিক জনমত গঠনে ভূমিকা পালন করে।

সদ্য স্বাধীন দেশে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শকে সামনে রেখে নব উদ্যমে নির্মাতারা স্বাধীনতা-উত্তর সংস্কৃতির ধারা ও চলচ্চিত্র নির্মাণ শুরু করেন। মুক্তিযুদ্ধ ফেরত মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি একদল তরুণ চলচ্চিত্র নির্মাণ ও অভিনয়ে আত্মপ্রকাশ করে। সশস্ত্র সংগ্রামের তরতাজা পটভূমিকে সামনে রেখে সত্তরের দশকের প্রথমার্ধে মুক্তিযুদ্ধকেন্দ্রিক গল্প ঢাকাই চলচ্চিত্রের প্রধান উপজীব্য হয়ে ওঠে। এই ধারার চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্টদের বেশিরভাগই ছিলেন রণাঙ্গনের সরাসরি যোদ্ধা অথবা মুক্তিযুদ্ধের সাথে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট। আবার চলচ্চিত্র ব্যবসা থেকে মুনাফা এবং কালো টাকা সাদা করতে অনেকেই পুঁজি বিনিয়োগ করায় ছবির নির্মাণ ব্যয়ের পাশাপাশি চলচ্চিত্রের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। দ্রুত সময়ের মধ্যে নতুন প্রযোজনা, পরিবেশনা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে, প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণ হতে থাকে দেশের আনাচে কানাচে। নির্মাতা তানভীর মোকম্মেল (১৯৯৮) এর মতে 'যুদ্ধের পরই টাটকা আবেগের কারণে অনেকেই মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ছবি নির্মাণে এগিয়ে আসার আগ্রহ দেখিয়েছিলেন কিংবা ঘোষণা দিয়েছিলেন।'

১৯৭৩ সালে উর্দু ভাষার চলচ্চিত্র নির্মাণ ও প্রদর্শন বন্ধ হয়ে যায়। রণাঙ্গনে অস্ত্রহাতে লড়াই করা একদল তরুণের সরাসরি অংশগ্রহণে মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষ ঘটনাকে উপজীব্য করে নির্মিত প্রথম চলচ্চিত্র 'ওরা ১১ জন' (১৯৭২) ব্যাপক প্রশংসিত হয়। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ও যুদ্ধ-পরবর্তী প্রেক্ষাপটকে ভিত্তি নির্মাণ করা হয় 'অরুনোদয়ের অগ্নিসাক্ষী (১৯৭২), 'রক্তাক্ত বাংলা' (১৯৭২), 'বাঘা বাঙ্গালী' (১৯৭২), 'আবার তোরা মানুষ হ' (১৯৭৩), 'ধীরে বহে মেঘনা'(১৯৭৩), 'আমার জন্যভূমি' (১৯৭৩), 'সংগ্রাম' (১৯৭৪), 'আলোর মিছিল' (১৯৭৪), 'কার হাসি কে হাসে' (১৯৭৪), 'মেঘের অনেক রং' (১৯৭৬)। এ সময় মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট নিয়ে নির্মিত চাষী নজরুল ইসলামের 'ওরা ১১ জন' চলচ্চিত্রে রণাঙ্গনে লড়াই করা ১১ জন মুক্তিযোদ্ধার বীরত্বগাথাঁ চিত্রায়ন হয়েছে। 'অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী' তে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর নৃশংসতা, শরণার্থী শিবির এবং যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়নপর এক অভিনেতার আত্ম- উপলদ্ধি তুলে ধরা হয়েছে। 'আবার তোরা মানুষ হ' (১৯৭৩) চলচ্চিত্র যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সদ্য ফিরে আসা একদল তরুণের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির ফারাক, বৈষম্য, সংকট, বিদ্যমান সামাজিক অবস্থার চিত্রায়ন। 'আলোর মিছিল'(১৯৭৪) এ যুদ্ধ পরবর্তী সামাজিক ও নৈতিক অবক্ষয়, সততা এবং রাষ্ট্র ও সমাজের প্রতি দ্বায়বদ্ধতা ফুঁটে উঠেছে। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের কাহিনি অবলম্বনে বেশ কয়েকটি সিনেমা নির্মিত হয়েছে সত্য, গুটি কয়েক বাদে সেখানে যুদ্ধকালীন জনচেতনার রূপান্তর কতটা প্রতিফলিত হয়েছে তা নিয়ে প্রশ্ন থেকে গেছে। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে নির্মিত এ সকল চলচ্চিত্রের সবগুলোই যে মানোর্ত্তীণ এই কথা বলার সুযোগ নেই। সদ্য সমাপ্ত মুক্তিযুদ্ধকে চিত্রায়িত করতে পরিচালকদের এই ব্যর্থতা ও মুক্তিযুদ্ধের বাণিজ্যিক অপব্যবহার, পুরো ইন্ডাস্ট্রির মেধার দৈন্য ও অতি-বাণিজ্যিক প্রবণতাকে প্রমাণিত করে (নাসরিন ও হক, ২০০৮: ৫৩)।

অনেকক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক ও নাটকীয় কাহিনি, মাত্রাতিরিক্ত বাণিজ্যিকীকরণ ও নির্মাণ ত্রুটির কারণে হাতে 'ওরা ১১ জন', 'ধীরে বহে মেঘনা', 'আলোর মিছিল', 'মেঘের অনেক রং'য়ের মতো হাতে গোনা কয়েকটি ছাড়া

বেশিরভাগ চলচ্চিত্রই মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের বাস্তব প্রতিফলনে ব্যর্থ হওয়ায় সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে। নির্মাতা আলমগীর কবিরের মতে, তখন অনেক প্রবীন ও নবীন নির্মাতা চলচ্চিত্রের বিষয়বস্তু হিসাবে মুক্তিযুদ্ধ বেছে নেয়। বেশিরভাগ নির্মাতা-প্রযোজক পাকিস্তানিদের দ্বারা বাঙ্গালি নারী ধর্ষণের মধ্যে বক্স-অফিস সাফল্যের উপাদান খুঁজে পায়। অনেককে আবার কালো টাকা 'সাদা' করার জন্য চিত্র ব্যবসায় পুঁজি লগ্নি করতে উৎসাহী হয় (হায়াৎ, ২০১১: ৪১)। তবে সত্তরের দর্শকের দ্বিতীয়ার্ধের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ছবি নির্মাণে ভাটার টান লক্ষ্য করা যায়।

এই দশকে গ্রামীণ জীবনের রূপায়ন, গ্রামীণ সামান্তপতিদের সাথে একদল প্রতিবাদী মানুষের বিরোধ, সমাজ চেতনা, গ্রাম ও শহরের জীবনপদ্ধতি ও মূল্যবোধের বিরোধ, তরুন-তরুনীর প্রণয় নিয়ে কিছু মৌলিক কাহিনি নির্ভর চলচ্চিত্র নির্মাণ করা হয়। ‘অবুঝ মন’ (১৯৭২), ‘শনিবারের চিঠি’, ‘মাসুদ রানা’ (১৯৭৪), ‘সুজনসখী’ (১৯৭৫), ‘চরিত্রহীন’ (১৯৭৫), ‘বাদী থেকে বেগম’ (১৯৭৫), ‘লাঠিয়াল’ (১৯৭৫), ‘পালঙ্ক’ (১৯৭৬), ‘নয়নমনি’ (১৯৭৬), ‘সূর্য গ্রহন’ (১৯৭৬), ‘বধূ বিদায়’ (১৯৭৮), ‘গোলাপী এখন ট্রেনে’ (১৯৭৮), ‘সারেং বউ’ (১৯৭৮), ‘অশিক্ষিত’ (১৯৭৮), ‘দি ফাদার’ (১৯৭৯), ‘সূর্য সংগ্রাম’ (১৯৭৯) মতো বক্তব্যনির্ভর ও সামাজিক ঘরানার চলচ্চিত্র নির্মিত হয়। এর বাইরে সত্তর দশকের বেশিরভাগ সময় জুড়ে সমাজ বাস্তবতার আলোকে চলচ্চিত্র নির্মাণের চেষ্টা হয়েছে। ব্যবসায়িকভাবে সফল ততটা সফল না হলেও ‘সূর্যকন্যা’ (১৯৭৬), ‘সীমানা পেরিয়ে’ (১৯৭৭), ‘বসুন্ধরা’ (১৯৭৮), ‘রুপালী সৈকতে’ (১৯৭৯), ‘ডুমরের ফুল’ (১৯৭৮) মতো চলচ্চিত্রগুলো প্রশংসিত হয়েছে।

এ সময় নির্মাতারা অধিক মুনাফার আশায় বাণিজ্যিক ছবি নির্মানের দিকে ঝুঁকে পড়ে। ৭০ এর দশকের শেষার্ধে মারপিট নির্ভর এ্যাকশান, পৌরানিক কাহিনি নির্ভর ফ্যান্টাসিধর্মী পোশাকি এবং বিদেশি ছবির কাহিনি অনুকরণে চলচ্চিত্র নির্মান শুরু হয়। ছবির গল্প, কাহিনী, চরিত্র, পোশাক-আশাক ও নির্মাণশৈলীতে প্রচলিত সমাজ-বাস্তবতা বর্হিভূত উপাদানের প্রবণতা দেখা যায়। শুরুতে ‘রংবাজ’ (১৯৭৩) ছবির মাধ্যমে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে প্রথমবারের মতো মারপিটের দৃশ্য সংযোজন করা হয়। ‘রংবাজে’র ব্যবসায়িক সাফল্য পরবর্তীতে ‘আসামী হাজির’, ‘মিন্টু আমার নাম’ (১৯৭৮), ‘বারুদ’ (১৯৭৯) এর মাধ্যমে চলচ্চিত্রে এ্যাকশান ঘরানার চলচ্চিত্রের আলাদা প্রকরণের সুত্রপাত করে। আরব্য রজনীর লোককাথা, রাজা বাদশার কাহিনি নির্ভর পোশাকী ছবির ‘বুলবুল-এ- বাগদাদ’ (১৯৭৯) এর মাধ্যমে এই সূত্রপাত হয়। সমালোচকরা মনে করেন, পাকিস্তান আমল থেকে শুরু করে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ঢাকাই সিনেমার একটি বড় অবলম্বন ছিল ফোক-ফ্যান্টাসি। পূর্ব বাংলার সাথে লোক সংস্কৃতির গভীর সম্পর্ককে সিনেমা-ওয়ালারাই খানিকটা কার্যকরভাবে কাজে লাগাতে পেরেছে (আজম, ২০১১) ।

বোম্বের 'শোলে' (১৯৭৫) র অনুকরণে ‘দোস্ত দুশমন’ (১৯৭৭) এবং ‘কালা উওর গোরা’ (১৯৭২) কাহিনি নিয়ে ‘নিশান’ (১৯৭৮) ছবির ব্যবসায়িক সাফল্যে হিন্দি সিনেমার কাহিনির অনুকরণে চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রবণতা শুরু হয়। তবে চলচ্চিত্র গবেষকরা মনে করেন, স্বাধীনতা পূর্ব এমনকি স্বাধীনতার অব্যবহিত পর থেকেই কলকাতা ও বোম্বের হিন্দি সিনেমার কাহিনির অনুকরণে নির্মাতারা ছবি নির্মাণ করতে থাকেন। গবেষক মুৎসুদ্দী (১৯৮৭: ১২৪) দেখিয়েছেন, ১৯৭৪ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ৩১ টি ছবির মধ্যে ১১ টি ছিল হিন্দি ছবির অনুকরণে নির্মিত। 'মায়ামৃগ' ছবির হুবহু নকলের অভিযোগে ১৯৭৭সালে সেন্সরবোর্ড 'অগ্নিশিখা' ছবির ছাড়পত্র বন্ধ করে দেয়। আটকে যায় যায় বেশ কিছু সিনেমার ছাড়পত্র। পরবর্তীতেও একই ধারা অব্যাহত থাকে। দুই একটি ব্যতিক্রমী প্রচেষ্টা ছাড়া বাংলাদেশের চলচ্চিত্র ব্যবসায়ীদের লক্ষ্য রইলো ব্যবসাসফল ছবি বানানোর পক্ষে। এতে নির্মাতারা দেশি-বিদেশি শিল্প সংস্কৃতি সবকিছু মিলিয়েই ছবি বানিয়ে বাজারে ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দর্শকেরা

লুফে নিল (সারোয়ার, ১৯৮৬)। সত্তরের দশকে সকল শ্রেণির দর্শকদের কাছে চলচ্চিত্র প্রধান বিনোদন মাধ্যমে পরিণত হয়। মফস্বল থেকে বড় শহরের সিনেমা হলগুলো অনেকটা সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে রূপ লাভ করে। তখন প্রেক্ষাগৃহে একটি চলচ্চিত্র মুক্তি দেয়া হলে দুই থেকে তিন মাস পর্যন্ত চলেছে। একই দর্শক একই চলচ্চিত্র তিন-চার বার দেখেছে এমন উদাহরনও সে সময় ছিলো। দর্শক হিসাবে পুরুষের পাশাপাশি সন্ধ্যায় এমনকি নাইট শোতে নারী দর্শক সিনেমা দেখতো (হায়দার, ২০২০: ১২৮)।

১৯৭৬ সালে সরকার চলচ্চিত্রকে শিল্প হিসাবে ঘোষণার পাশাপাশি প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণের জন্য ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা করা হয়। এই দশকে আরও দুইটি উল্লেখ্যযোগ্য ঘটনার মধ্যে রয়েছে মধ্যে রয়েছে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার এবং রুচিশীল ও শিল্পসম্মত চলচ্চিত্র নির্মাণে সরকারিভাবে আর্থিক অনুদান প্রদান। ১৯৭৬-৭৭ অর্থ বছরে প্রথমবারের মতো চারটি ছবি আর্থিক অনুদানের জন্য মনোনীত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষ পরবর্তী আবু ইসহাকের উপন্যাস অবলম্বনে ‘সূর্য দীঘল বাড়ি’ (১৯৭৯) স্বাধীন বাংলাদেশে নির্মিত প্রথম চলচ্চিত্র হিসাবে আর্ন্তজাতিক সম্মান অর্জন করে। ১৯৭৬ সালে ওয়েজ অনার্স স্কিমের আওতায় রেকর্ড প্লেয়ার, টেপ রেকর্ডার, টু ইন ওয়ানের মতো ইলেট্রনিকক্সের নামে ভিসিআর আমদানি শুরু হয়। প্রচলিত প্রেক্ষাগৃহের বাইরে সিনেমা দেখার সুযোগ সৃষ্টি হয়। সত্তরের দশকে একদল তরুণ নির্মাতা ইনডোরের ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে তেজগাঁওয়ের পুরানো রেল স্টেশন, কক্সবাজারের রুপালী সৈকত, কাপ্তাইয়ের মনোরম লেক, চট্টগ্রামের বনাঞ্চল, সিলেটের চা বাগান, নদীর ঘাট, লঞ্চ স্টিমার, রমনা পার্ক, অনাথ আশ্রম, বোটানিক্যাল গার্ডেন, সংবাদপত্র অফিসের মতো আউটডোর বেছে নেন। কোনটার দু'একটি সিকোয়েন্স, কোনটার অধিকাংশ আবার কোনটার পুরোপুরিই আউটডোরে চিত্রায়িত হয়েছে। ‘রুপালী সৈকতে’, ‘নাগরদোলা’, ‘লাঠিয়াল’, ‘গোলাপী এখন ট্রেনে’, ‘অশিক্ষিত’, ‘সূর্য দীঘল বাড় ‘,‘তোলপাড়’, ‘ডুমুড়ের ফুল’ ছবিগুলোর অধিকাংশ দৃশ্যই আউটডোরে চিত্রায়িত হয়েছে।

**১৯৮০ দশক:**

সামরিক শাসন, স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের অস্থির এক রাজনৈতিক অবস্থার মধ্যে ৮০ এর দশকের প্রায় পুরোটা সময় অতিবাহিত হয়। মধ্যপ্রাচ্যে জনশক্তি রফতানি, তৈরি পোশাক খাতে বিপুল কর্মসংস্থানের সুযোগ এই দশকে গ্রামীণ অর্থনীতিতে পরিবর্তন আসে। কর্মসংস্থানের কারণে নারীসহ গ্রামীণ জনপদ থেকে শ্রমিকরা শহরে বসবাস শুরু করে। টেলিভিশন ও ভিসিআর তখনো উচ্চ ও উচ্চমধ্যবিত্তের হাতে থাকায় বিপুল এই জনগোষ্ঠীর হাতে দৃশ্যমান বিনোদন বলতে চলচ্চিত্র ছাড়া আর কিছু ছিল না। এর ইতিবাচক প্রভাব পড়ে চলচ্চিত্র ব্যবসায়। ১৯৮৩ সালে সরকার প্রেক্ষাগৃহ থেকে প্রমোদকর আদায়ের নতুন পদ্ধতি 'ক্যাপাসিটি ট্যাক্স' প্রবর্তন করে। নতুন এই পদ্ধতিতে চলচ্চিত্র ব্যবসায় মুনাফা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। নতুন নতুন প্রেক্ষাগৃহ তৈরি ও চলচ্চিত্র নির্মাণ বেড়ে যায়। কাদেরের (১৯৮৩) তথ্যমতে, ১৯৮৩ সালের জুনে দেশে মোট ৩৮৫টি প্রেক্ষাগৃহ থাকলেও ক্যাপাসিটি ট্যাক্স চালু করার পর ১৯৮৮ সালের জুনের মধ্যে আরও ৩৫০ টি প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণ করা হয়। তবে আশির দশকে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বাণিজ্যিকভাবে ভিসিআরের অবৈধ প্রদর্শনী ও মুভি ক্লাবের আড়ালে অনুমোদনহীন ভিসিআর ব্যবসা চলচ্চিত্র শিল্পের জন্য সংকট হিসাবে আর্বিভূত হয়। ভিসিআরের বদৌলতে ভারতীয় হিন্দি ও বাংলা ভাষার চলচ্চিত্র নিয়ে দর্শকের মধ্যে আগ্রহ তৈরি হয়। এক শ্রেণির নির্মাতা চলচ্চিত্রে বিদেশি বিশেষ করে বোম্বে ছবির হুবহু নকল করে ছবি নির্মাণের প্রবণতা চলচ্চিত্রকে হুমকির মুখে ফেলে। ১৯৮২ সালের মার্চে দেশে সামরিক আইন জারির পর ভিসিআরের বাণিজ্যিক প্রদর্শনী বন্ধ ঘোষণা করা হলেও ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য স্থানে প্রকাশ্য ও গোপনে প্রদর্শনী অব্যাহত থাকে। আশির দশকের শেষ দিকে বিনোদনের বিকল্প মাধ্যম টেলিভিশন ও ভিসিআর হাতের নাগালে চলে আসায় চলচ্চিত্র

দর্শকের বড় অংশ মধ্যবিত্ত সিনেমা হলে ছবি দেখা কমিয়ে দেয়। আশির দশকে সামাজিক, পারিবারিক ও প্রেম নির্ভর রোমান্টিক ড্রামা, মারদাঙ্গা, ফ্যান্টাসি, পোশাকি, সাহিত্যনির্ভর, লোক কাহিনি নির্ভর ধারার বৈচিত্র্যপূর্ণ চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রবণতা দেখা যায়। তবে মৌলিক কাহিনী নির্ভর চলচ্চিত্র নির্মাণ অনেকটাই কমে আসে। চলচ্চিত্রের নাচ-গানে নারীর বাণিজ্যিক ব্যবহারের প্রবণতাও দেখা যায়।

৮০ দশকে আর্থ-সামজিক প্রেক্ষাপটে চলচ্চিত্রের বাণিজ্যিক দিক বিবেচনায় মুনাফা লাভের আশায় এক শ্রেণির নির্মাতা বিনোদন নির্ভর চলচ্চিত্র নির্মাণ করে সফল হয়। আগের দশকের ধারাবাহিকতায় রূপকথার কল্পকাহিনীর সাথে নাচগানের মতো বাণিজ্যিক উপাদান যুক্ত করে সফল হওয়ায় আশির দশক জুড়ে পোশাকি ছবির দাপট চলে। 'তাজ ও তলোয়ার' (১৯৮০), 'নর্তকী' (১৯৮১), 'আল হেলাল' 'সওদাগর' (১৯৮২), 'লাইলী মজুন', 'চন্দন দ্বীপের রাজকন্যা' (১৯৮৩), 'আবে হায়াৎ' (১৯৮৩), 'পদ্মাবতী' (১৯৮৩), 'বানজারান' (১৯৮৩), 'রসের বাইদানি' (১৯৮৪), 'নরম গরম' (১৯৮৪), 'সালতানাৎ' (১৯৮৪), 'নাগ পূর্ণিমা' (১৯৮৪), 'রঙ্গিন রূপবান' (১৯৮৫), 'যাদুমহল' (১৯৮৮) ছবিগুলো ব্যবসায়িকভাবে সফল হয়। পোশাকী ছবির পাশাপাশি আশির দশকে ''জনি (১৯৮৩), 'চ্যালেঞ্জ' (১৯৮৩), 'সিআইডি' (১৯৮৪), 'শরীফ বদমাইশ'(১৯৮৪), 'আওয়ারা' (১৯৮৫), 'সারেন্ডার' (১৯৮৭), 'মাস্তান', 'লালু মাস্তান' (১৯৮৭), 'হুশিয়ার' (১৯৮৮) অ্যাকশন ছবির বৈচিত্র্য দেখা যায়। ভিসিআরে কল্যাণে হংকংয়ের মারদাঙ্গা ও কুংফু ছবির জনপ্রিয়তার এই দশকে শহিদুল ইসলাম খোকন 'লড়াকু' (১৯৮৬) ছবিতে মার্শাল আর্ট নির্ভর নতুন অ্যাকশন ধারার প্রবর্তন করেন, যা তরুণ সমাজের কাছে জনপ্রিয়তা লাভ করে। ৯০ দশক পর্যন্ত এ্যাকশান ধারা চলচ্চিত্র নির্মাণ অব্যাহত থাকে।

এই দশকের শেষ দিকে ফোক- ধারার চলচ্চিত্র 'বেদের মেয়ে জোসনা' (১৯৮৯) সর্বকালের ব্যবসা সফল চলচ্চিত্রগুলোর একটি। রাজ কুমার ও বেদেনীর প্রেম, বিচ্ছেদ ও মিলনের গল্প নিয়ে নির্মিত চলচ্চিত্রটি ব্যবসায়িক সফলতার পাশাপাশি সমালোচকদেরও নজর কাড়ে। ষাটের দশকের মাঝামাঝিতে রূপবানের পর 'বেদের মেয়ে জোসনা' ছাড়া অন্য ছবি নিয়ে এত উন্মাদনা দেখা যায়নি। গবেষক আহমেদ মাযহার (২০০৮) মনে করেন, সে- সময়ে শহরগুলোতে ব্যাপকভাবে গড়ে উঠতে শুরু করে গার্মেন্টস শিল্প। এই শিল্পের শ্রমিকদের অধিকাংশই নগরে এসেছিল সরাসরি গ্রাম থেকে। গ্রামাঞ্চলের চির পরিচিত গল্পগুলোর রঙ্গিন উপস্থাপনা তাই তাদের আকৃষ্ট করল। তাছাড়া তখন পর্যন্ত নগরবাসীদের মধ্যে গ্রামজীবনের স্মৃতি নিঃশেষিত হয়ে যায়নি বলে এই গল্পগুলো বা লোককাহিনির আদলে নির্মিত চলচ্চিত্রের আবেদন ততদিনে ফুরিয়ে যায়নি। ছবিটি সে সময় চলচ্চিত্রে আয়ের দিক থেকে সর্বকালের সেরার মর্যাদা লাভ করে। পরে ৯০ দশকে কলকাতায় ছবিটির রিমেকও আয়ের দিক থেকে রেকর্ড করে। নাসরীন ও হক (২০০৮) মনে করেন, আশির দশকে ভিসিআর-ভিসিপির আগমনে দর্শকরা যখন ঘরে বসে হিন্দি ছবি দেখতে ব্যস্ত তখন বেদের মেয়ে জোসনা দর্শককে আবার হলমুখী

করে। ৮০ দশকে সাহিত্য নির্ভর চলচ্চিত্র নির্মানের প্রবণতা দেখা যায়। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে অবলম্বনে ‘দেবদাস’ (১৯৮২), ‘রামের সুমতি’ (১৯৮৫), ‘সৎভাই’ (১৯৮৫), ‘শুভদা’ (১৯৮৬), ‘পরিনীতা’ (১৯৮৬), ‘রাজলক্ষী শ্রীকান্ত’ (১৯৮৭) তারাশঙ্কার বন্দোপাধ্যায়ের উপন্যাস নিয়ে 'চাঁপা ডাঙ্গার বউ' (১৯৮৬) এর মতো সাহিত্য নির্ভর একাধিক চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে। আশির দশকজুড়ে সাহিত্যভিত্তিক এসব চলচ্চিত্র নতুন সম্ভাবনা নিয়ে হাজির হয়। যদিও এই দশকের প্রাধাণ্যশীল ধারা পোশাকি-ফ্যান্টাসি, সামাজিক অ্যাকশান, লোককাহিনি ভিত্তিক চলচ্চিত্রের বিপরীতে এই ধারার অবস্থান ছিল দূর্বল (হায়দার, ২০২০: ১৫৮)।

আশির দশকের শুরু থেকে নকল চলচ্চিত্র নির্মানের প্রাধান্য দেখা গেছে। নকল ছবি নির্মাণের প্রবণতা এতটা মারাত্মক আকার ধারন করে যে বাধ্য হয়ে সরকারকে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছে। নকলের অভিযোগে বেশ কিছু চলচ্চিত্রের মুক্তিও আটকে দেয় সেন্সর বোর্ড। আশির দশকের ‘আখি মিলন’, ‘নসীব’,‘ নিশানে’র মতো ছবিগুলো কাহিনি, সংলাপ, গান ও নাচের দৃশ্য হিন্দি ছবি থেকে নকল করা।(সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ১৯৮৫) প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয় 'হাতে গোনা কয়েকটি ছবি ছাড়া প্রায় সব ছবি অপরুচি, চৌর্যবৃত্তি ও অপসংস্কৃতির ধারক'। এই দশকের গোড়ার দিকে 'ছুটির ঘন্টা' (১৯৮০) এবং 'এমিলের গোয়েন্দা বাহিনী' (১৯৮০), ‘লালুভুলু’, ‘পুরষ্কার’ (১৯৮৩) মতো শিশুতোষ চলচ্চিত্র নির্মাণ হয়। মারদাঙ্গা ও পোশাকি ধারার ছবির বাইরে ‘ঘুড্ডি’ (১৯৮০), ‘এখনই সময়’ (১৯৮০), ‘কসাই’(১৯৮০), ‘জন্ম থেকে জ্বলছি’ (১৯৮১), ‘লাল সবুজের পালা’(১৯৮১), ‘দুই পয়সার আলতা’ (১৯৮১), ‘বড় ভাল লোক ছিল’ (১৯৮২), ‘মোহনা’ (১৯৮২), ‘নাজমা’ (১৯৮৩), ‘মান সন্মান’ (১৯৮৩), ‘ভাত দে’ (১৯৮৪), ‘নয়নের আলো’, ‘প্রিন্সেস টিনা খান’ (১৯৮৪), ‘সুরুজ মিয়া’ (১৯৮৪), ‘পেনশন’ (১৯৮৪), ‘জীবন নৌকা’ (১৯৮৪), ‘দহন’ (১৯৮৫), ‘মহানায়ক’ (১৯৮৬), ‘ভেজাচোখ’ (১৯৮৭), ‘সাক্ষর’ (১৯৮৮), ‘তোলপাড়’ (১৯৮৮), ‘ঢাকা ৮৬’ (১৯৮৮) মৌলিক গল্প নির্ভর ছবিও নির্মাণ হয়। আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ে একদল তরুণের উদ্যোগে স্বাধীনভাবে ১৬ মিলিমিটারে বিকল্প ধারার চলচ্চিত্র নির্মাণ শুরু হয়। তানভীর মোকাম্মেলের ‘হুলিয়া’ (১৯৮৫), মোরশেদুল ইসলামের ‘আগামী’ (১৯৮৪) ছাড়াও ‘বখাটে’ (১৯৮৫), ‘চাক্কী’ (১৯৮৬), ‘আবর্তন’ (১৯৮৮), ‘আদম সুরত’ (১৯৮৯) ও ‘দুরন্ত’ (১৯৮৯)। এফডিসির ষ্টুডিওর বাইরে নির্মিত চলচ্চিত্রগুলো বাণিজ্যিক প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শন ছাড়া ঢাকা থেকে বিভাগীয়, জেলা এমনকি মফস্বল শহরের অডিটোরিয়াম মিলনায়তন ও ছোটকক্ষে প্রজেক্টরের মাধ্যমে দর্শকের সামনে প্রদর্শন করা হতো।

**৯০ দশক:**

৮০ এর দশকের ভিসিআরের যে দাপট শুরু হয়, ৯০ দশকেও তা অব্যাহত ছিল। সাথে প্রযুক্তির অগ্রযাত্রায় কমপ্যাক্ট ডিস্ক (সিডি) প্লেয়ার ও রঙ্গিন টেলিভিশন সেটের সহজলভ্যতায় উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তের সাথে তরুণদের ভিসিআরের দর্শক হিসাবে যুক্ত হওয়ার প্রভাব পড়ে চলচ্চিত্রে। তার উপর ৯০ দশকের মাঝামাঝিতে মহানগর, জেলা ও বড় শহরকেন্দ্রিক স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেলের দাপটে চলচ্চিত্রকে সত্যিকারে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হয়। ১৯৯১ সালে শুরুতে বড় শহরগুলোতে স্যাটেলাইন চ্যানেল (ডিস লাইন) এর যাত্রা শুরু হয়। বিশেষ করে মহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণির কাছে স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল বিনোদনের প্রধান অনুষঙ্গ হয়ে দাড়ায়। বিনোদনের বিকল্প মাধ্যমের সুযোগ থাকায় দর্শকরা ঘরে বসেই ইংরেজি, ভারতীয় হিন্দি ও বাংলা ভাষায় নির্মিত সিনেমা দেখার সুযোগ পায়। 'আগের দশকে নানা কারণে প্রেক্ষাগৃহ থেকে যে মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত বেরিয়ে গিয়েছিলো, তারা ৯০ দশকের শুরুতে মাঝে মাঝে প্রেক্ষাগৃহে ফিরলেও বিনোদনের মুল জায়গা ছিল টেলিভিশন ও ভিসিআর '(হায়দার, ২০২০)।

৯০ এর দশকে শুরুতে নতুন মুখের আগমন চলচ্চিত্রের উল্লেখ্যযোগ্য ঘটনা। এই দশকের শুরুতে 'চাঁদনী' (১৯৯১) অভাবনীয় সফলতা পুরানোদের পাশাপাশি নতুন অভিনেতা অভিনেত্রী চলচ্চিত্র দর্শকদের মাঝে ব্যাপক সাড়া ফেলে। টিএনজ প্রেম নির্ভর ছবির বাণিজ্যিক সাফল্যে ৮০'র দশকের ফ্যান্টাসি-পোশাকি ও লোক কাহিনি ছবির দাপট ৯০'র দশকে অনেকটাই কমে যায়। নতুন নায়ক-নায়িকা নিয়ে ছবি তৈরি করে ব্যবসায়িকভাবে সফল হতে থাকেন নির্মাতারা। কাদের (১৯৯৩) মতে, 'চাঁদনী' চলচ্চিত্রটির বিপুল ব্যবসার পিছনের অন্যতম কারণ ছিল টিএনএজ নতুন তারকা জুটি নাঈম ও শাবনাজ। 'চাঁদনী' সাফল্যের পর বলিউডের একটি ব্যবসা সফল ছবির গল্প নিয়ে একই ধারায় নবাগত সালমান শাহ- মৌসুমিকে জুটি করে সুপারহিট চলচ্চিত্র 'কেয়ামত থেকে কেয়ামত (১৯৯৩) নির্মাণ করেন। 'পরিচালক সোহান মৌলিক গল্পও বাছেননি, আবার নকল ছবির দুর্ণামও কুড়াননি। তিনি মুম্বাই থেকে সুপারহিট ছবি 'কেয়ামত থেকে কেয়ামত তক' ছবির কপিরাইট নিয়ে শট বাই শট দৃশ্যায়ন করেন এবং তাতেই ছবি সুপারহটি হয় (নাসরিন ও হক, ২০০৮:৬২)। একই পরিচালক বলিউডের সুপারহিট সিনেমা 'সাজান' (১৯৯১) এর কপিরাইট নিয়ে 'স্বজন' (১৯৯৪) এবং 'দিল' (১৯৯১)'র কাহিনি নিয়ে 'আমার ঘর আমার বেহেশত' (১৯৯৭) মতো হিট সিনেমা নির্মাণ করেন। নতুন তারকাদের মধ্যে সালমান শাহর অভিনয় দক্ষতা নগরকেন্দ্রিক তরুন তরুনীদের কাছে সমাদৃত হয়। প্রথমে সালমান-মৌসুমি ও পরে সালমান শাবনূর জুটির বেশ কিছু সিনেমা ব্যবসা সফল হয়। 'তরুনদের পোশাকে সালমানের কালোর্ত্তীন ফ্যাশন, কণ্ঠে সালমানের সিনেমার গান। সালমানের মাথার কাপড় প্যাঁচানো, হ্যাট, চশমা, কী নকল হয়নি তখনকার তরুণদের মাঝে (মামুন, ২০২০)। বাংলাদেশের চলচ্চিত্র ইতিহাসে 'বেদের মেয়ে জোসনা'র পর ব্যবসার সফল সিনেমা সালমান শাহর 'স্বপ্নের ঠিকানা' আয় করে ১৯ কোটি টাকা। তৃতীয় অবস্থানে থাকা 'সত্যের মৃত্যু নেই' (১৯৯৬) আয় সাড়ে ১১ কোটি টাকা (হায়দার, ২০২০) । কিন্তু সালমান শাহর আকস্মিক মৃত্যুতে টিএনজ প্রেমের ছবির জোয়ার অনেকটা থেকে যায়। এছাড়া নব্বই দশকে শাবনূর, পূর্নিমা, ওমর সানি, পপি, শাকিল খান, রিয়াজ, ফেরদৌসের মতো এক ঝাঁক নতুন তারকার আগমন ঘটে।

এই দশকের প্রথমার্ধে চলচ্চিত্রের গতানুগতিক ধারার কাহিনির বাইরে সমাজে বিদ্যমান অসঙ্গতির প্রতিবাদ জানিয়ে নির্মিত রাজনৈতিক বক্তব্যধর্মী সামাজিক-অ্যাকশন ছবি 'দাঙ্গা' (১৯৯২), 'আজকের হাঙ্গামা' (১৯৯২), 'ত্রাস' (১৯৯৩),'চাঁদাবাজ'(১৯৯৩), 'সিপাহি' (১৯৯৫), 'দেশপ্রেমিক' (১৯৯৫) ব্যবসায়িক সফলতা লাভ করে। বড় বড় শহরের বাইরে জেলা, মফস্বল শহর, উপজেলা এমনকি প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রেক্ষাগৃহ প্রসার লাভ করে। ষাটের দশকে 'রূপবান' ছবি মুক্তির পর দেশে হলের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল। সর্বশেষ 'বেদের মেয়ে জোসনা' পরও নতুন হল তৈরি হয়। ৯০ এর দশকের শেষভাগ পর্যন্ত দেশে সিনেমা হল ছিল ১ হাজার ৩০০ টির মতো (হক, ২০২৫)। পারিবারিক সেন্টিমেন্ট ও সামাজিক অ্যাকশান নির্ভর ছবি 'পিতা মাতা সন্তান' (১৯৯১), 'কাসেম মালার প্রেম' (১৯৯১), 'বাংলার বধু' (১৯৯৩), 'প্রেম দিওয়ানা' (১৯৯৪), 'টাকার অহংকার' (১৯৯৪), 'কালিয়া'

(১৯৯৪), 'স্বপ্নের ঠিকানা'(১৯৯৫) 'বিক্ষোভ', 'দেন মোহর' (১৯৯৬), 'সত্যের মৃত্যু নেই' (১৯৯৬), 'লুটতরাজ' (১৯৯৭), 'বাবা কেন চাকর' (১৯৯৭), 'শান্ত কেন মাস্তান' (১৯৯৮), 'ভন্ড' (১৯৯৮), 'বিয়ের ফুল' (১৯৯৯), 'মৃত্যুর মুখে' (১৯৯৮), 'আম্মাজান' (১৯৯৯) ব্যবসায়িকভাবে সফলতা লাভ করেন।

জি টিভি, এমটিভি ও স্টার টিভিতে বলিউডের সিনেমা, গান ও ছবির ট্রেলার দেখে ঢাকাই ছবির দর্শকদের প্রত্যাশা ও রুচির পরিবর্তন দেখা যায়। ফলে নির্মাতারা অনেকটা বাধ্য হয়ে ভারতীয় অনুকরণে চলচ্চিত্র নির্মাণ শুরু করেন। সিনেমার কাহিনি থেকে শুরু করে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নামের ক্ষেত্রেও (সালমান শাহ, ওমর সানি, শাহরুখ শাহ, নানা শাহ, রাভিনা) বোম্বের অনুকরণ শুরু হয়। নাসরিন ও হক (২০০৮) মনে করেন, এই ভারত নির্ভরতা ইন্ড্রাস্ট্রির চরম দৈন্য ও দেউলিয়াত্ব প্রমাণ করে, শূন্য দশকে এসে সেজন্য ইন্ড্রাস্ট্রি অতল গহবরে তলিয়ে যায়।

এই দশকের শেষ দিকে প্রবল অ্যাকশান, সহিংসতা ও যৌনতা নির্ভর চলচ্চিত্র নির্মাণ শুরু হয়। আবার নামকরণের ক্ষেত্রে 'খাইছি তোরে', 'যাবি কই', 'কাল্লু মাম ', 'গিরিঙ্গিবাজ', 'বিশ্ব হারামি', 'পারলে ঠেকাও' এর মতো অবাস্তব ও উদ্ভট প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া কিছু অসাধু চলচ্চিত্র ব্যবসায়ীদের 'কাটপিস' নামে সেন্সর বহির্ভূত এক ধরনের বিশেষ দৃশ্য জুড়ে দেয়া নিয়ে সে সময় চলচ্চিত্রে অঙ্গনে ব্যাপক সমালোচনার জন্ম দেয়। প্রথম দিকে এ ধারার ছবিগুলো ভালো ব্যবসা করলেও মধ্যবিত্ত শ্রেণি ও নারী দর্শক সিনেমা হলে যাওয়া বন্ধ করে দেয়। সিনেমা হলে দর্শক হিসাবে থাকে শুধু নিম্নবিত্তের খেটে খাওয়া মানুষ। এ অবস্থায় ৯০ দশকের শেষ দিকে সিনেমা হলগুরো ধীরে ধীরে বন্ধ হতে থাকে। আজম (২০১১: ১০৭) মনে করেন, চলচ্চিত্রে আমূল পরিবর্তন ঘটে ৯০ দশকে। 'এ সময় ডিশ এন্টেনার কল্যাণে তরতাজা বিদেশি জিনিস ড্রয়িংরুমে প্রবেশ করতে থাকে। ভিসিডির সহজলভ্যতা এমনকি নিম্নবিত্ত-নিম্ন-মধ্যবিত্তেরও ভিজুয়াল ক্ষুধা মেটানোর ব্যবস্থা করে। এর সাথে যোগ করতে হবে ইন্টারনেট সুবিধার প্রসার। সব মিলিয়ে প্রত্যক্ষ ফল হল দুটি-একদিকে বিনোদনের জন্য সিনেমা হলেও যাওয়ার প্রয়োজন ফুরালো: ঢাকাই সিনেমার বিপরীতে বহু শক্তিমান প্রতিদ্বন্দ্বী আর্বিভুত হল।'

তবে ৯০ দশকে জেলে জীবনের দুঃখ দুর্দশা ও বেঁচে থাকার সংগ্রামের গল্প নিয়ে বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ প্রযোজনা ছবি 'পদ্মা নদীর মাঝি' (১৯৯৪), প্রেমের গল্প নিয়ে বিনোদনধর্মী ছবি 'হঠাৎ বৃষ্টি' (১৯৯৮) দুই বাংলায় সমাদৃত হয়। সাহিত্য নির্ভর গল্প নিয়ে 'আগুনের পরশমনি' (১৯৯৩), 'পোকা মাকড়ের ঘর বসতি' (১৯৯৬) 'হাঙ্গর নদী গ্রেনেড' (১৯৯৭), 'শ্রাবণ মেঘের দিন' (১৯৯৯) নির্মিত হয়। এর বাইরে 'একাত্তরের যীশু' (১৯৯৩), 'অন্যজীবন' (১৯৯৪), 'নদীর নাম মধুমতি' (১৯৯৫), 'চাকা' (১৯৯৫), 'দুখাই' (১৯৯৮), 'চিত্রা নদীর পাড়ে' (১৯৯৯) ব্যবসায়িক সফলতায় ব্যর্থ হলেও কাহিনি ও নির্মাণশৈলী প্রশংসিত হয়।

নব্বই দশকের শুরুতে ঢাকায় যখন একের পর এক ছবি ব্যবসা সফল হয়েছে, তখন কলকাতার পরিচালকরা ছবিগুলো রিমেক করা শুরু করেন। পরিচালক কাজী হায়াৎ মনে করেন, সে সময় বাংলা চলচ্চিত্রের রমরমা সময়ে কলকাতার ইন্ড্রাস্ট্রি ছিল মৃতপ্রায়। ওদের বাণিজ্যিক সিনেমার গল্পের সংকটের কারণে আমাদের সিনেমা রিমেক করতো। মূল ছবির গান ও ফুটেজ নিয়ে সেটার সঙ্গে আর কিছু দৃশ্য ধারন করে কলকাতায় রিমেক করা হতো (হোসেন: ২০২৩)। বাংলাদেশে 'বেদের মেয়ে জোসনা'র জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগিয়ে লাগিয়ে ১৯৯১ সালে কলকাতায় ছবিটি রিমেক করা হয়। 'সুজন সখী', 'বাবা কেন চাকর', 'দাঙ্গা', 'নয়নের আলো', 'সন্তান যখন শত্রু', 'প্রেমের সমাধি', 'স্বপ্নের ঠিকানা', 'ঝিনুকমালা', 'সন্ধি', 'মা যখন বিচারক', 'চাকরানী', 'জর্জ ব্যারিষ্টার'সহ বেশ কিছু সিনেমা রিমেক করেন পরিচালক স্বপন সাহা। এছাড়া 'মায়ের অধিকার', 'মায়ের দোয়া', 'প্রাণ স্বজনী' মতো সামাজিক ও পারিবারিক মেলোড্রামার মুভিগুলো রিমেক হয়েছে। কলকাতার বাংলা ছবির

প্রযোজক অশোক ধানুকা মতে, নব্বই দশকে কলকাতার সিনেমার বাজার খুব খারাপ ছিল। সিনেমার বাজেট ছিল ১০ থেকে ১২ লাখ টাকা। 'তখন ঢাকার সিনেমার সোনালী সময় ছিল। বাঘা বাঘা গল্প লেখক, চিত্রনাট্যকার ছিলেন। ঢাকাকে টক্কর দেয়ার ক্ষমতা কলকাতার ছিল না (হোসেন: ২০২৩)।

**শূন্য দশক:**

শুন্য দশকে বাংলাদেশি চলচ্চিত্রের দৃশ্যপট পাল্টে যেতে থাকে। প্রযুক্তির কল্যাণে ঘরে বসে সিনেমা দেখার সুযোগ পেয়ে দর্শক হল বিমুখ হয়। ভিডিও পাইরেসির কারণে সদ্য মুক্তি পাওয়া ছবিও বাড়িতে বসে দেখার সুযোগ আসে। এতে চলচ্চিত্র ব্যবসায় মন্দা নেমে আসে। পাশাপাশি সহিংসতা ও অশ্লীলতার অভিযোগ, প্রেক্ষাগৃহের পরিবেশ ও চলচ্চিত্রের মানের অবনতির অভিযোগ উঠতে থাকে। দর্শকের অভাবে একের পর এক বন্ধ হতে থাকে প্রেক্ষাগৃহ। শুরুতে চলচ্চিত্র নির্মাণ স্বাভাবিক থাকলেও ক্রমান্বয়ে কমে আসতে থাকে। শুরুতে কথিত অশ্লীল সিনেমার ব্যবসা রমরমা হলেও সুস্থ ও বিনোদন ছবির নামি নির্মাতারা কোণঠাসা হয়ে পড়েন।

সেন্সর বর্হিভূত দৃশ্য সংযোজনের অভিযোগে কয়েকটি সিনেমার প্রদর্শনী নিষিদ্ধ ঘোষণা এবং কয়েকজন অভিনয় শিল্পী বয়কটের মুখে পড়েন। একাধিক পরিচালকের সদস্য পদও বাতিল করে চলচ্চিত্র পরিচালক সমিতি। পাইরেসি বন্ধ ও চলচ্চিত্রের সুস্থ পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্টদের রাস্তায় নেমে মিছিল, সমাবেশ পর্যন্ত করতে দেখা যায়। ঢাকাই চলচ্চিত্রের এই ক্রান্তিকালে শূন্য দশকে (২০০০-২০০৯) সাল পর্যন্ত ৭৮৬ টি চলচ্চিত্র মুক্তি পায় (এফডিসি ওয়েবসাইট)। শূন্য দশকের প্রথমার্ধে গড়ে প্রতি বছর শতাধিক ছবি মুক্তি পেলেও বেশিরভাগ ছবিই ছিল কম বাজেটের, সহিংসতা নির্ভর ও অশ্লীলতার অভিযোগে অভিযুক্ত। এফডিসির হিসাব অনুযায়ী, ২০০১-২০০২ অর্থ বছরে প্রতিষ্ঠানটি থেকে সরকার যেখানে ৮ কোটি ৪০ হাজার টাকার রাজস্ব আদায় করে, ২০০৫-২০০৬ অর্থ বছরে তা কমে দাড়ায় ৬ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা। তবে ২০০৭ সালে সরকারিভাবে র‍্যাপিড অ্যাকশান ব্যাটেলিয়ান (র‍্যাব) নেতৃত্বে গঠিত টাস্কফোর্সের অভিযানে পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়।

শূন্য দশকে চলচ্চিত্রের সংকটকালে রোমান্টিক ও সামাজিক ঘরানার বেশ কিছু চলচ্চিত্র নির্মাণ হয় এবং দর্শক কর্তৃক সমাদৃত হয়। ‘মনের মাঝে তুমি’ (২০০৩), ‘খায়রুন সুন্দরী’ (২০০৪), ‘কোটি টাকার কাবিন’ (২০০৬), ‘চাচ্চু’ (২০০৬), ‘মোল্লা বাড়ির বউ’ (২০০৬), ‘হৃদয়ের কথা’ (২০০৬) ব্যবসায়িক সাফল্য লাভ করে। ‘লাল সালু’ (২০০১), ‘মাটির ময়না’ (২০০২), ‘শ্যামল ছায়া’ (২০০৪), ‘জয়যাত্রা’ (২০০৫), ‘দারুচিনির দ্বীপ’ (২০০৭) ‘শঙ্খনাদ’ (২০০৮), ‘নিরন্তন’ (২০০৬), ‘খেলাঘর’ (২০০৬), ‘স্বপ্নডানায়’(২০০৭) মতো ছবি চলচ্চিত্রে হতাশার মাঝে আশার আলো নিয়ে আসে। ‘মাটির ময়না’ (২০০২) বাংলাদেশের প্রথম চলচ্চিত্র হিসাবে কান চলচ্চিত্র উৎসবে সন্মানজনক 'ফিপরেস্কি ইন্টারন্যাশনাল ক্রিটিকস অ্যাওয়ার্ড’ লাভ করলেও তখনকার সেন্সরবোর্ড 'অতিরিক্ত স্পর্শকাতর' বলে প্রথমে নিষিদ্ধ করে, পরে আদালতের রায়ে প্রদর্শনের অনুমতি পায়। গ্রামীণ পটভূমিতে নির্মিত পারিবারিক ও নিটোল প্রেমের ছবি ‘মনপুরা’ (২০০৯) হল বিমুখ দর্শকদের ফের সিনেমা হলে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। ছবিটি ২০১০ সালে কলকাতায় 'অচিন পাখি' নামে রিমেক হয়।

শূন্য দশকে চলচ্চিত্র শিল্পের সংকটকালে বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেগুলোর চলচ্চিত্র নির্মাণের নতুন প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। তাদের প্রযোজিত চলচ্চিত্র সিনেমা হলে মুক্তি পাওয়ার আগে 'ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ার' নামে টেলিভিশন চ্যানেল মুক্তি দেয়া হয়। নামী লেখকের গল্প থেকে কাহিনি, সীমিত নির্মাণ ব্যয়ের সাথে টেলিভিশনে মুক্তি দিয়ে কর্পোরেট পুঁজি নির্ভর বিজ্ঞাপন থেকে খরচ উঠিয়ে নেয়ার এই ধারা প্রথাগত মূলধারার চলচ্চিত্রে সামান্তরাল মাধ্যম হিসাবে হাজির হয়। টেলিভিশন চ্যানেলে প্রযোজনা ও প্রদর্শনের ধরন চলচ্চিত্রের সার্বিক

উন্নয়নে আদৌ কোন প্রভাব রাখছে কিনা তা নিয়ে সে সময় সংশয় প্রকাশ করেন খোদ চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্টরা। সমালোকদের মতে, চলচ্চিত্র অর্থনীতির প্রাণকেন্দ্র হচ্ছে পেক্ষাগৃহ।এখানেই জনগনের সাথে চলচ্চিত্রের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ। বিজ্ঞাপনের টাকায় টিভি প্রিমিয়ারের মাধ্যমে বিনিয়োগ তুলে ফেলে একটি বা দুটি হলে প্রতীকী মুক্তি দিয়ে চলচ্চিত্র শিল্পের আরাধ্য মুক্তি সম্ভব নয় (মাসুদ, ২০০৬)।

শূন্য দশকের শেষ দিকে প্রযুক্তিগত দিক থেকে বড় ধরনের পরিবর্তন সাধিত হয়। ডিজিটাল ফরম্যাটে চলচ্চিত্র নির্মাণ এবং গতানুগতিক প্রেক্ষাগৃহের পরিবর্ত মাল্টিপ্লেক্সের সূচনা এবং প্রেক্ষাগৃহের প্রদর্শন ব্যবস্থায় ডিজিটাল প্রজেক্টরের ব্যবহার এই দশকে বাংলাদেশি চলচ্চিত্রের জন্য আরেকটি মাইলফলক। ডিজিটাল ফরম্যাটে নির্মিত 'টেলিভিশন', 'আয়নাবাজি', 'ডুব', 'দেবী' এর মতো চলচ্চিত্রগুলো ব্যবসায়িকভাবে সফল ও সমালোচকের দৃষ্টিতে প্রশংসিত হয়। বিশ্বায়ন পরবর্তী প্রেক্ষাপট, সমকালীন সমাজ, সম্পর্ক ও প্রেমের মতো বিচিত্র মনস্তাতাত্ত্বিক জটিলতাগুলো চলচ্চিত্রর আধেয় হিসাবে উপস্থাপিত হয়।

**২০১০ পরবর্তী:**

তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন, ভিসিআর, ভিসিপি, সিডি ডিস্কের সহজপ্রাপ্তি, স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেলের মতো বিকল্প বিনোদন মাধ্যমের সাথে কম্পিউটার, ল্যাপটপ, ট্যাব ও স্মার্টফোনের মতো প্রযুক্তিগত বিনোদন উপকরণ যুক্ত হওয়ায় শূন্য দশকের শেষ দিকে চলচ্চিত্র শিল্পের জন্য মারাত্মক সংকট তৈরি করে। একই সময়ে গ্রাম ও মফস্বলের ছোট চায়ের দোকানে টেলিভিশনের মাধ্যমে সিনেমা দেখার সুযোগ তৈরি হওয়ায় নিম্ন আয়ের মানুষেরাও সিনেমা হলে যাওয়া বন্ধ করে দেয়। আর্থিক ক্ষতির মুখে মালিকরা প্রেক্ষাগৃহ ভেঙ্গে বহুতল আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ শুরু করেন। অনেক সিনেমা হল মালিক আবার আর্থিক ক্ষতি মেনে নিয়ে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া ব্যবসাকে টিকিয়ে রেখেছেন। ঈদের মতো উৎসব এবং যৌথ প্রযোজনার কিছু ছবি ছাড়া অন্য সময় প্রেক্ষাগৃহে ছবি বুকিংয়ের টাকা ও উঠে আসে না (প্রথম আলো, ২০২১)।

এই দশকে ‘পোড়ামন’ (২০১৩), ‘নাম্বার ওয়ান সাকিব খান’ (২০১০), ‘মোষ্ট ওয়েলকাম’ (২০১২), ‘নিঃস্বার্থ ভালবাসা’ (২০১৩) ‘পোড়ামন’ (২০১৩), ‘পূর্ণদৈর্ঘ্য প্রেম কাহিনি’ (২০১৩), ‘অগ্নি’ (২০১৪), ‘ছুঁয়ে দিলে মন’ (২০১৫), ‘অগ্নি ২’ (২০১৫) ছাড়াও ঢাকা ও কলকাতার যৌথ প্রযোজনায় ‘বাদশা দ্য ডন’, ‘শিকারি’, ‘নবাব’, ‘রোমিও বনাম জুলিয়েট’ ব্যবসা সফল হয়। যৌথ প্রযোজনার এ সকল ছবির বেশিরভাগই ছিল দক্ষিণ ভারতে তামিল, তেলেগু সিনেমার অনুকরণে নির্মিত। অমিতাভ রেজার ‘আয়নাবাজি’ (২০১৬) ছবির কাহিনি ও নির্মাণশৈলীর পাশাপাশি ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জন করে। সিনেমাটি পরে তেলেগু ভাষায় 'গায়ত্রী' নামে রিমেক হয়। ২০১৭ সালে নীতিমালা সংশোধনের পর যৌথ প্রযোজনায় চলচ্চিত্র নির্মাণ কমে যায়। হল মালিকদের

দাবির মুখে সাফটা চুক্তির অধীনে ভারত থেকে ‘জাওয়ান’, ‘ইনসপেক্টর নটিকে’, ‘সুলতান’, ‘ভাইজান এলোরে’ প্রভৃতি ছবি প্রদর্শনের জন্য আমদানি করা হয়। ২০২০ সালে করোনা মহামারিতে প্রেক্ষাগৃহ অনির্দিষ্টকালে জন্য বন্ধের ঘোষণায় চলচ্চিত্র ব্যবসায় ধ্বস নামে। করোনা পরবর্তীতে চলচ্চিত্র ব্যবসা শুধু দুই ঈদ ও বড় কোন উৎসবকেন্দ্রিক হয়ে পড়ে। এই দশকে ছোট পর্দার নির্মাতারা বাণিজ্যিক চলচ্চিত্র নির্মাণ শুরু করেন। পারিবারিক, সামাজিক ও রোমান্টিক ঘরানার ছবির পরিবর্তে হলিউড কিংবা দক্ষিণ ভারতের ছবির আদলে অ্যাকশন, রোমান্সের সাথে থ্রিলারের সংমিশ্রণে নতুন জঁরার ছবি নির্মাণের প্রবণতা দেখা যায়। করোনা পরবর্তী সময়ে মুক্তি পাওয়া 'পরান', 'হাওয়া', 'প্রিয়তমা', 'তুফান', 'রাজকুমার', 'বাজি', 'তান্ডব' এর মতো চলচ্চিত্রগুলো দর্শক সমাদৃত হয়। প্রথাগত প্রেক্ষাগৃহকে কেন্দ্র করে চলচ্চিত্র ব্যবসা এখন কেবল উৎসবকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে। বর্তমানে সারা বছর চালু থাকে ৬০ টির মতো সিনেমা হল। এর বাইরে ঈদের মৌসুমে বড় বাজেটের তারকাবহুল ছবি মুক্তি পেলে বন্ধ থাকা কিছু সিনেমা হল সাময়িকভাবে চালু করা হয়। তখন সব মিলিয়ে ১০০ থেকে ১৫০ টির মতো হলে ছবি প্রদর্শন করা হয়। দেশের ৬৪ টি জেলার মধ্যে ২৯ টি জেলা এখন সিনেমা হলশূন্য (মাজিদ, ২০২৪)।

করোনাকালীন লকডাউনে দীর্ঘ সময় বন্ধ থাকে প্রেক্ষাগৃহ, থমকে যায় সিনেমা নির্মাণ। দর্শকের বিনোদন শূন্যতা পূরণে ২০২০ সালে বিকল্প মাধ্যম হিসাবে ওটিটি (ওভার দ্য টপ) প্লাটফর্মে সিনেমা মুক্তি দেয়া শুরু হয়। নেটফ্লিক্স, আমাজন প্রাইম, এইচবিও-র মতো জনপ্রিয় বিদেশি প্লাটফর্মগুলোর সাথে পাল্লা দিয়ে দেশি অনলাইন প্লাটফর্মগুলো চরকি, বঙ্গবিডি, আইস্ক্রিন, হইচই চলচ্চিত্র শিল্পে সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে। প্রথাগত প্রেক্ষাগৃহের বাইরে ওটিটি প্লাটফর্মকে ব্যবহার করে কম্পিউটার,স্মার্ট টেলিভিশন ও স্মার্ট মুঠোফোন ব্যবহার করে সিনেমা দেখার সুযোগ স্বল্পসময়ের মধ্যে দর্শকের কাছে জনপ্রিয়তা লাভ করে। সিনেমা হলে পরিবর্তে অনলাইন প্ল্যাটফর্মে মুক্তি দিয়ে বাণিজ্যিকভাবে লাভবান হচ্ছেন নির্মাতারা। আবার কিছু চলচ্চিত্র প্রথমে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি দেয়ার কিছুদিন ওটিটিতে দেখানো হয়। ঢাকা এ্যাটাক, বরবাদ, দাগি, জংলি, হাওয়ার মতো জনপ্রিয় সিনেমাগুলো প্রেক্ষাগৃহের পাশাপাশি এই প্লাটফর্মে মুক্তি পেয়ে দর্শক নন্দিত হয়েছে। পুরানোদের পাশাপাশি নতুন প্রজন্মের নিমার্তা ও কলাকুশলীদের সামনে ওটিটি প্লাটফর্ম নতুন সম্ভবনা নিয়ে হাজির হয়েছে।

**যৌথ প্রযোজনা:**

১৯৭৩ সালে 'ধীর বহে মেঘনা' সিনেমার মাধ্যমে ভারতের সাথে যৌথ উদ্যোগে চলচ্চিত্র নির্মান শুরু হয়। পরবর্তীতে ভারত ছাড়াও পাকিস্তান, নেপাল, শ্রীলংকা ও তুরস্কের সাথে যৌথ উদ্যোগে নির্মিত চলচ্চিত্র 'যৌথ প্রযোজনার চলচ্চিত্র' নামে পরিচিতি পায়। সত্তরের দশকে ‘তিতাস একটি নদীর নাম’, ‘সূর্যকন্যা’ ও ‘পালঙ্ক’ যৌথ প্রযোজনায় নির্মিত হয়। আশির দশকে যৌথ প্রযোজনার ছবি নির্মাণে ফের জোয়ার আসে। ‘দুরদেশ’ (১৯৮২), ‘অবিচার’ (৮৩), ‘লাভারস’ (১৯৮৪), ‘আপোষ’, ‘মিস লংকা’, ‘অবিচার’ (১৯৮৫), ‘হিমালয়ের বুকে’ (১৯৮৬), ‘ব্যবধান’, ‘দেশ বিদেশ’ (১৯৮৭), ‘দুনিয়া’, ‘বাপের বেটা’ (১৯৮৮), ‘সর্পরানী’, ‘বলবান’, ‘বিরোধ’ (১৯৮৮), ‘লেডি স্মাগলার’, ‘গুনাহ’ (১৯৮৯), নির্মিত হয়। যৌথ প্রযোজনায় চলচ্চিত্র নির্মাণকে প্রাতিষ্ঠানিক রুপ দিতে ১৯৮৬ সালে সরকারিভাবে একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়। নীতিমালায় যৌথ প্রযোজনায় চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে শিল্পী, কলাকুশলী এবং বাণিজ্যিক দিকের মতো বিষয়গুলো উভয় দেশ থেকে সমানভাবে অংশগ্রহণ নিশ্চিতের কথা বলা হয়। ২০১২ সালে নীতিমালার সংশোধিত রূপ প্রকাশ পায়। আশির দশকে উল্লেখ্যযোগ্য সংখ্যায় যৌথ প্রযোজনা চলচ্চিত্র নির্মিত হয়। দুই বা ততোধিক দেশের পুজি, শিল্পী কলাকুশলী নিয়ে নির্মিত চলচ্চিত্র নিজ নিজ দেশে আলাদা নামে মুক্তি পেতো। ৯০ দশকে ‘লাভ ইন আমেরিকা’, ‘পদ্মা নদীর মাঝি’, ‘স্বামী কেন আসামী’, ‘মেয়েরাও মানুষ’, ‘আমি সেই মেয়ে’, ‘হঠাৎ বৃষ্টি’, ‘চুড়িওয়ালা’, ‘বর্ষা বাদল’,

শূন্য দশকে 'স্বামী ছিনতাই', 'মনের মাঝে তুমি', 'মনের মানুষ', 'শেষ যুদ্ধ', 'আগুন জ্বলবেই', 'বেশ করেছি প্রেম করেছি', 'নসিমন', 'মায়ের মতো ভাবি', 'সবার উপরে প্রেম' ছবি নির্মাণ করা হয়। ২০১৪ সাল থেকে পরবর্তী তিন বছর চলচ্চিত্রে যৌথ প্রযোজনার চিলচ্চিত্রের বড় প্রভাব দেখা যায়। যৌথ প্রযোজনায় 'আমি শুধু তোমায় চেয়েছি', 'রুমিও বনাম জুলিয়েট', 'আশিকী'(২০১৫), 'ব্লাক' (২০১৫), 'হিরো' ৪২০, 'অঙ্গার' (২০১৫), 'বাদশা দ্য ডন', 'শিকারী', 'রক্ত', 'বস-২' , 'নবাব' , 'চালবাজ' , 'নিয়তি', 'প্রেমি ও প্রেমি', 'রংবাজ' (২০১৬) মতো চলচ্চিত্র নির্মাণ করা হয়। ২০১৭ সালে যৌথ প্রযোজনার চলচ্চিত্র নির্মাণের নামে 'যৌথ প্রতারনা'র অভিযোগ এনে নির্মাতা, শিল্পী ও কলাকুশলীদের ১৪টি সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত চলচ্চিত্র এক্যজোট আন্দোলনে নামে। আন্দোলনের প্রেক্ষিতে 'যৌথ প্রযোজনার চলচ্চিত্র নির্মান নীতিমালা-২০১২ (সংশোধিত) আরও যুগোপযোগী করার পর যৌথ প্রযোজনার ছবির সংখ্যা কমে যায়।

বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের সাত দশকের বিবর্তন পর্যালোচনায় স্পষ্ট যে, শুরুর দিকে সামাজিক পরিবর্তনের বিভিন্ন স্তরে চলচ্চিত্র একটি শক্তিশালী গণমাধ্যম হিসাবে বিনোদনের পাশাপাশি মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ, নিজস্ব সত্তা ও জাতিরাষ্ট্র গঠনের ভূমিকা পালন করে। এই বিবর্তনের ধারাই স্বাধীনতা পরবর্তী দশকগুলোতে চলচ্চিত্রের একটি শক্তিশালী কাঠামো গড়ে তুলতে সহায়তা করে। স্বাধীনতার পরবর্তী দশগুলোতে বাংলাদেশি চলচ্চিত্রে চড়াই-উতরাই ও সামাজিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে হয়েছে। সত্তর দশকে মুক্তিযুদ্ধকে প্রধান্য দিয়ে চলচ্চিত্র নির্মিত হলেও আশির দশকে পোশাকি ও মারদাঙ্গা ছবির প্রধান্য দেখা যায়। নব্বই দশকে স্যাটেলাইট টেলিভিশন এবং পরবর্তীকালে তথ্য প্রযুক্তির আর্বিভাব চলচ্চিত্র শিল্পকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দেয়। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলচ্চিত্রের দর্শক রুচি-পছন্দ এবং নির্মাণের ধরনে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। একদিকে বিনোদনের বিকল্প মাধ্যমের সহজলভ্যতা, ছবি নির্মাণ ও কারিগরি মানের অবনতির কারণে দর্শকের বড় অংশ মধ্যবিত্ত শ্রেণি প্রেক্ষাগৃহ বিমুখ হয়েছে, অন্যদিকে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার ও ওটিটি প্ল্যাটফর্মের উত্থান চলচ্চিত্রের জন্য নতুন করে সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিয়েছে। বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের সাত দশকের এই দীর্ঘ পরিক্রমায় নানা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হলেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক বির্বতনের ধারায় নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। ষাটের দশকে প্রেক্ষাগৃকেন্দ্রিক দর্শকপ্রিয়তা থেকে হাল সময়ের ডিজিটাল ও অনলাইন প্ল্যাটফর্মের যুগে উত্তরণ বাংলাদেশি চলচ্চিত্রের বিবর্তন ও সামাজিক রূপান্তরকে নির্দেশ করে।

**তথ্যসূত্র:**


১. আসগর, সৈকত (২০০২)। আব্দুল জব্বার খান, জীবনী গ্রন্থমালা। ঢাকা, বাংলা একাডেমি।
২. আহমেদ, তারেক (১৯৯২)। ষাট দশক: আমাদের প্রাকলগ্নের চলচ্চিত্র। মন্তাজ চার। ঢাকা, ঋত্বিক চলচ্চিত্র সংসদ।
৩. আজম, মোহাম্মদ (২০১১)। অশ্লীলতা-বিরোধী প্রপাগান্ডা ও 'সুস্থ' চলচ্চিত্রের যুগে ঢাকাই সিনেমা। যোগাযোগ, জানুয়ারী, সংখ্যা ১০।
৪. ইসলাম, আহমেদ আমিনুল (২০১৪)। বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্পের সংকট। বাংলাদেশের চলচ্চিত্র, চলচ্চিত্রে বাংলাদেশ (প্রথম প্রকাশ)। ঢাকা, ভাষাচিত্র।। পৃঃ ৩৩০।
৫. কাদের, মির্জা তারেকুল (১৯৯৩)। বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্প । ঢাকা, বাংলা একাডেমি।
৬. নাসরিন, গীতিয়ারা ও হক, ফাহমিদুল (২০০৮)। বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্প, সংকটে জনসংস্কৃতি। ঢাকা, শ্রাবণ প্রকাশনী।
৭. প্রথম আলো (২০২১)। 'বগুড়ার সিনেমা হল, ১০ বছরে ৩১ রূপালী পর্দার আলো নিভিছে'। ৪ ফেব্রুয়ারি। নেয়া হয়েছে, https://www.prothomalo.com/entertainment/ ।

৮. মাসুদ, তারেক (২০০৬)। টেলিভিশন চ্যানেল চলচ্চিত্র নির্মাণের উদ্যোগ: একটি পর্যালোচনা। ২য় জাতীয় চলচ্চিত্র সম্মেলন, বাংলাদেশ ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসাইটি, ঢাকা।
৯. মাযহার, আহমেদ (২০০৮)। বাঙ্গালীর সিনেমা । ঢাকা, অনন্যা প্রকাশনী।
১০. হোসেন, মকফুল (২০২৩)। ভারতে বাংলাদেশী সিনেমা-সিরিজের রিমেক, (বাংলাদেশের পরিচালক কাজী হায়াৎ এবং ভারতীয় প্রযোজক অশোক ধানুকার মন্তব্য)। প্রথম আলো, জুন, ১১। সংগ্রহ করা হয়েছে, https://www.prothomalo.com/entertainment/।
১১. মোকাম্মেল, তানভীর (১৯৯৮)। সিনেমার শিল্পরূপ। উদ্ধৃত, হায়াত, অনুপম (২০১১)। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র (১৯৭১-২০০৭) । ঢাকা, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ।
১২. মুৎসুদ্দী, চিন্ময় (১৯৮৭)। বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের সামাজিক অঙ্গীকার। ঢাকা: বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী।
১৩. মুৎসুদ্দী, চিন্ময় (১৯৮২)। সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ঈদ সংখ্যা, ১৯৮২।
১৪. মাজিদ, আলাউদ্দিন (২০২৪) । 'বন্ধ হয়েছে বিখ্যাত যত সিনেমা হল'। বাংলাদেশ প্রতিদিন, ১৯ নভেম্বর, ২০২৪। সংগ্রহ করা হয়েছে, https://www.bd-pratidin.com/printnews/entertenment-
১৫. news/2024/11/19/1051491/8207271332।
১৬. মামুন, অনিন্দ্য (২০২০)। ঢাকাই ছবির জনপ্রিয় জুটির আদি-অন্ত। দৈনিক সমকাল, ৫ মে। সংগ্রহ করা হয়েছে, samakal.com/entertainment/article/21800
১৭. রহমান, ড. মতিন (২০২১)। বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্পের (১৯৪৭-১৯৭৫) স্বকীয়তা। ঢাকা পোষ্ট, ১৪ ফেব্রুয়ারী।
১৮. রাজু, জাকির হোসেন (২০০২)। বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাস: একটি পুনর্পঠন। গণমাধ্যম ও জনসমাজ (নাসরিন, গীতিয়ারা ও অন্যান্য সম্পা.)। ঢাকা, শ্রাবণ প্রকাশনী। পৃ. ২২৯।
১৯. শফিক, সালেহ (২০২৫)। 'রূপবান': দেশি চলচ্চিত্রের প্রথম সুপারহিট; দেড় লাখের ছবির আয় ২০ লাখ! দি বিজনেস ষ্টান্ডার্ড, ১১ নবেম্বর। সংগ্রহ: ২৩ নবেম্বর, ২০২৫, সংগ্রহ করা হয়েছে,
২০. https://tbsnews.net/bangla/feature/news-details-411391
২১. হায়াৎ, অনুপম (২০১১)। বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক চলচ্চিত্র। ঢাকা, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ।
২২. হায়াৎ, অনুপম (২০০৭)। জহির রায়হানের চলচ্চিত্র পটভূমি, বিষয় ও বৈশিষ্ট্য। ঢাকা, দিব্য প্রকাশ।
২৩. হায়াৎ, অনুপম (২০১৭)। বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিকথা। ঢাকা, পলল প্রকাশনী।
২৪. হায়াৎ, অনুপম (১৯৮৭)। বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাস। ঢাকা, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন করপোরেশেন।
২৫. হক, নাজমুল (২০২৫)। '৮ ছবি মুক্তির মাসে হল বন্ধের হিড়িক', (চলচ্চিত্র প্রদর্শক সমিতির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মিয়া আলাউদ্দিনের মন্তব্য)। প্রথম আলো, ২১ সেপ্টেম্বর। সংগ্রহ করা হয়েছে, https://www.prothomalo.com/entertainment/
২৬. হায়দার, কাজী মামুন (২০২০)। বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের নৃতাত্ত্বিক ইতিহাস (১৯৫৬-২০১৫), (অপ্রকাশিত পিএইচডি অভিসন্দর্ভ)। ইনষ্টিটিউট অব বাংলাদেশ ষ্টাডিজ। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
২৭. https://rulrepository.ru.ac.bd/bitstream/handle/123456789/1030/D4703.pdf
২৮. সাপ্তাহিক বিচিত্রা (১৯৮৫) বর্ষপত্র সংখ্যা। পৃ.১৮৩।
২৯. বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএফডিসি) ওয়েব সাইট। https://fdc.gov.bd/